KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 82 বিধান পল্লী, যাদবপুর, কল-৩২ (21) সি/2 আর. এইচ-ই ৩০২ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কল-৫৪
Collection : KLMLGK	Publisher : অরুণ বসু
Title : অন্তরতম	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 18 19 20 21	Year of Publication : Sep 1983 May 1985 May 1986 Feb 1989 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অরুণ বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অজ্ঞাতবাস

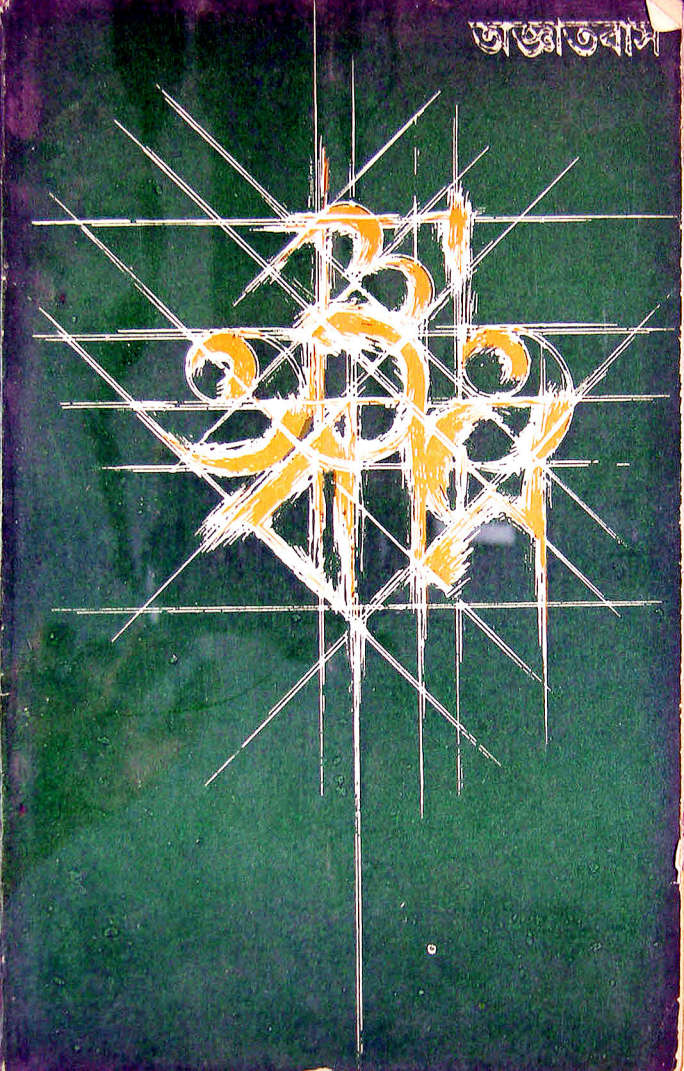

আমাদের প্রকাশনীর কয়েকটি বই

অরুণ বসুর প্রথম কবিতার বই **অনুশাসন ব্যতীত আজ**

দাম ছ' টাকা

বুদ্ধদেব গুহ'র একগুচ্ছ মিষ্টিগল্পের সংকলন **কুন্দহার**

দাম দশ টাকা

নিখিলেশ সেনের বাংলায় লেখা ব্রিজ খেলা শেখার বই **ব্রিজ**

দাম কুড়ি টাকা

নীলাঞ্জন

৫৯ মটলেন, কলকাতা-১৩।

ফোন: ২৪১৪৯২

শুভেচ্ছা সহ

এস, ডি, দাশ

খাগড়া, সোনাপট্টী, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্য লটারীর পরিবেশক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞা-
প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের কাগজ প্রথাবিরুদ্ধ
কবিতা ও কবিতা প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের
অজ্ঞাতবাস সংকলন :১৮, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ অজ্ঞাতবাস সংকলন : ১৮,

অজ্ঞাতবাস প্রকাশ প্রসঙ্গে: দেবদাস আচার্য মানস রঞ্জন ভট্টাচার্য সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সমীর কুমার চক্রবর্তী বিশ্বনাথ ঘটক সংযোজন: অরুণ বসু পুনর্মুদ্রণ: জীবনানন্দ দাশ সরোজ দত্ত শৈলেশ্বর ঘোষ গুচ্ছ কবিতা: নিত্য মালাকার মল্লিকা সেনগু সমীরণ রায় স্নেহাশিস শুকুল অরুণ বসু একাধিক কবিতা: অশোক দত্ত সঞ্জীব প্রামাণিক উৎপল দে তুষার চৌধুরী রবীন্দ্র বিশ্বাস অপারূতা লাহিড়ী মৃদুল দাশগুপ্ত তাপস রায় মবিনুল হক অনির্বাণ লাহিড়ী হীরক ভট্টাচার্য কবিতা: গৌতম বসু অরুণ সাধুখাঁ রতনতনু ঘাটী নির্মল হালদার মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য সিদ্ধার্থ বসু রঞ্জন সরকার তাপস ভট্টাচার্য গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় শংকর চক্রবর্তী জীবতোষ দাস অঙ্কুর সাহা সমরেন্দ্র মণ্ডল তপন ভট্টাচার্য দেবদাস আচার্য কবিতা বিষয়ক রচনা: সুবোধ সরকার দেবদাস আচার্য একটি ব্যক্তিগত গদ্য: মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রচ্ছদ: রতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদ মুদ্রণে: নিউ কল্পনা প্রেস কলকাতা-৭২ অজ্ঞাতবাসের পক্ষে প্রকাশক অরুণ বসু ৪২ বিধান পল্লী যাদবপুর কলকাতা-৩২ থেকে প্রকাশিত এবং আম প্রেস ৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত দাম: তিন টাকা

যে কয়েকটি পত্রের বই ও পুস্তিকা কৌতূহলী পাঠকদের কবিতা পাঠের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারে

শব ও সন্ন্যাসী অরুণেশ ঘোষ
টুঁটো জগন্নাথ দেবদাস আচার্য
জলপাই কাঠের এপ্রাজ মৃদুল দাশগুপ্ত
আলেয়া হ্রদ জয় গোস্বামী
ঋক্ষ মেষ কথা সুবোধ সরকার
দরোজা খোলা নদী শৈলেশ্বর ঘোষ
নরকের মেঘ অনির্বাণ লাহিড়ী
চল্লিশ চাঁদের আয়ু মল্লিকা সেনগুপ্ত
রাত্রি চতুর্দশী পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
অন্নপূর্ণা ও শুভকাল গৌতম বসু
পৌত্তলিক গৌতম চৌধুরী
শেষ রাতের ছবি গৌতম সেনগুপ্ত
পুরোনো এ জীবন আমাদের নয় নির্মল হালদার
নশ্বর অলীক যাতায়াত হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাঙা প্রপাতের মুখে রঞ্জন সরকার
বালি ও তরমুজ প্রসূন বন্দোপাধ্যায়
ধরে রাখতে চাই সুজিত সরকার
দিনলিপি সিদ্ধার্থ বসু
পাখি বাজার সমর রায়চৌধুরী
জীবন দেখার ব্রত চক্রবর্তী
দেবী আসছেন নির্মলেন্দু ঘোষাল
রাখা হয়েছে কমলালেবু স্বদেশ সেন
লোচনদাস কারিগর উৎপলকুমার বসু

আসুন, অজ্ঞাতবাস আবার প্রকাশ করি

প্রায় সাত-আট বছর বন্ধ থাকার পর আবার 'অজ্ঞাতবাস' প্রকাশিত হল।
আবার কেন অজ্ঞাতবাস প্রকাশিত হবে?—এরকম আমরা ভেবেছি। আসলে এর কোনো ভালো উত্তর নেই। তবু ভেবেছি।
বাংলা লিট্‌ল ম্যাগের কি খুব অভাব আছে? অজ্ঞাতবাস কি সব লিট্‌ল ম্যাগের চেয়ে ভালো লিট্‌ল ম্যাগ হয়ে উঠবে? নাকি কোনো 'মুভমেণ্ট' দানা বাঁধানোর প্রয়োজনে 'অজ্ঞাতবাস' একটি অপরিহার্য কাগজ হবে?—এসব বলার কোনো মানে হয় না। একথা আগেই বলে রাখি।
বিনয় নয়, জেহাদ নয়, করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গেও নয়—তবু, অজ্ঞাতবাস প্রকাশিত হল। অনেকেই জানেন যে নবদ্বীপ নামক মফঃস্বলের এক বিখ্যাত শহর থেকে অজ্ঞাতবাস ষাট দশকের গোড়া থেকে সত্তরের মাঝামাঝি অব্দি প্রকাশিত হয়ে চলত। নানা কারণে তারপর থেকে অজ্ঞাতবাস বন্ধ হয়ে ছিল। কোমরে আবার খানিকটা জোর পেয়ে অজ্ঞাতবাস আরো কিছুটা চলতে আগ্রহী হয়েছে।
বাংলার অনেক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন তরুণ কবিকে অজ্ঞাতবাস তখন সঙ্গে পেয়েছিল। তাঁরা কাগজটি ভালোবেসেছিলেন। কাগজটির সঙ্গে তাঁদের মমত্ববোধ জড়িয়ে গিয়েছিল বলেই তো কাগজটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। এখনও, অজ্ঞাতবাস সেই একই আশা মনে পোষণ করে।
তখন শুধু সুনির্বাচিত সঠিক কবিতাগুলিই অজ্ঞাতবাস ছাপত। তার লক্ষ্য ছিল সেই সব তরুণ কবি যাঁদের খ্যাতি ছিল না হয়ত, কিন্তু ছিল লেখার যোগ্যতা। কবিতার মহান কাজগুলিই ছিল অজ্ঞাতবাসের আসল সম্পদ। এক সাচিং লণ্ঠন নিয়ে অজ্ঞাতবাস পশ্চিমবাংলায় এবং পশ্চিমবাংলার বাইরেও ঘুরে বেড়াত। এখনও ব্যাপারটা তাই-ই থাকবে, তবে তার সঙ্গে আরেকটু লবণ আমরা মেশাবো এবার। আমরা চেষ্টা করব পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর এবং আগামী আশির একটা ধারাবাহিক কবিতা-পাঠের, আলোচনার ব্যবস্থা রাখার। একে মূল্যায়ন আমরা বলব না, বলব, পাঠ। আর, বলাই বাহুল্য যে, কবি ছাড়াও, নিষ্ঠাবান পাঠকের জন্যেও আমরা অজ্ঞাতবাসে কয়েকটি পৃষ্ঠা ছেড়ে দেব। ওরা তা আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন।
না, কখনো আমরা কোনো টুঁটি টিপে ধরা কাপালিকতার আশ্রয় নেব না। কখনো আমরা সেবাদাসের দাসত্ব করব না। বা, আমরা আমাদের মতামতগুলি জোর করে পাঠকদের ওপর চাপিয়ে দেব না, কবিদের ওপরও না। আমরা মানুষের

গভীর বিবেচনা শক্তির ওপর আস্থা রাখি। তাই একটা Symposium-এর ব্যবস্থা রাখা হবে অজ্ঞাতবাসে। চিঠিপত্রের আকারে, বিতর্কের মাধ্যমে সেখানে সকলের জন্যে উন্মুক্ত স্থান ছেড়ে দেওয়া হল।

এসব পড়ার পর, পাঠক, বুঝতেই পারছেন যে, অজ্ঞাতবাস একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে চাইছে। এখন, একটা লিট্‌ল ম্যাগের ক্ষেত্রে তো এটাই প্রয়োজন। হ্যাঁ, আরো একটা কথা, কোনো আন্দোলনের 'নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই নেতৃত্ব দেওয়ার' ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু, যাঁরা নতুন কাব্য-আন্দোলনের শরিক হতে চান, তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে অজ্ঞাতবাসকে ব্যবহার করতে পারবেন। দয়া করে মনে রাখবেন, আমরা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ নই, আমরা কবিতা ও কবির কাছেই কেবলমাত্র অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এটা কি ভাবে সম্ভব! এতে কি কোনো চরিত্র দাঁড়াবে? আমরা বলছি, তা দাঁড়াবে, কেননা, তা দাঁড় করানোর দায়িত্ব তো কবি ও পাঠকরাই প্রধানত নেবেন। সম্পাদক সামান্যই নেবেন।

তবু, কিছু কিছু কথা আমাদের বলার থাকবেই। ভেবে দেখে আপনারা তা গ্রহণ অথবা বর্জন করবেন। এর বেশি আমাদের আপাতত বলার কিছু নেই।

অজ্ঞাতবাস-এর পক্ষে

দেবদাস আচার্য মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ঘটক সমীর কুমার চক্রবর্তী দেবদাস আচার্য মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য সোমনাথ

সংযোজন

তবু কিছু টুকিটাকি কথা থেকেই যায়। যা বলার লোভ আমাদের সেই অন্ধকার বা আলোর দিকে নিয়ে যেতে চায়, সেখান থেকে দুত কিছু শেষ বা শুরু করার কিছু আছে।

শেষ অজ্ঞাতবাস বেরিয়েছিলো অক্টোবর, ১৯৭৬-এ। সেটা ছিল ১৭ নম্বর সংকলন। মাঝখানের সাত বছর কেন অজ্ঞাতবাস বের হয় নি তা আজো আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। রঞ্জন এবং মূলতঃ দীপক চট্টোপাধ্যায়ের ওপর অজ্ঞাতবাস প্রকাশ করা-না-করার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত ছিলো। ওদের যোগ্যতা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তবু, অজ্ঞাতবাস বের হয় নি, এটা ঘটনা। আমিও আর চাইছিলামনা অজ্ঞাতবাস আবার নতুন ক'রে বের করতে। সাত বছরে পৃথিবী অনেক বদলে যায়। আমাদের প্রত্যেকের বয়েস সাত বছর এগিয়ে গেছে। এই সাত বছরে অনেক যুবক-যুবতী তাঁদের মহার্ঘ যৌবন হারিয়েছেন। আবার অনেক কিশোর-কিশোরী পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠেছেন শরীরে, মননে। ফলে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের জলহাওয়া, শারীরবিক্ষেপ ও সত্যানুসন্ধান বোঝা রিয়েলি খুব কঠিন। যাটের প্রথম দিকে যাঁরা অজ্ঞাতবাসে লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই চল্লিশ ছু'য়েছেন অথবা চল্লিশ ছু'ই-ছু'ই। তাঁদের লেখায় ম্লানতা ও পুনরুক্তির সুস্পষ্ট আভাস ক্রমশঃ ফুটে উঠছে। অন্যদিকে যাঁরা সদ্য তরুণ, তাঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করছেন, পূর্ববর্তীদের আর লেখার বিশেষ প্রয়োজন নেই। ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন' তাঁদের ছুটি।

এইরকম একটি সন্ধিসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার কয়েকজন নিকটতম বন্ধু কাগজটি আবার বের করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। প্রায় এক বছর আগে কৃষ্ণনগর দেবনাথ স্কুলের একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসার পথে হঠাৎ পোস্ট অফিসের সামনের চায়ের দোকানে দেবদাসের সঙ্গে দ্যাখা। পুরোনো কথার জের হিসেবে আবার অজ্ঞাতবাস বের করার প্রসঙ্গে ও কিছু কথাবার্তা তুললো। আমি যথারীতি উৎসাহিত বোধ করলুম। যেরকম এর আগেও বহুবার করেছি।

সত্যি বলতে কি, নিজের ভিতরে একটা আত্মপীড়ন দীর্ঘদিন ধ'রে অনুভব করছিলাম। তাগিদ যতো-না ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো তাড়না। দেবদাস সেই তাড়নায় মাঝেমাঝেই আগুন ধরিয়ে দিতো।

বলা বেশি, এর পর আমি নিজে অনেকের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। বিশেষ ক'রে আর্থিক দিকটা—যা খুবই মর্মান্তিক হ'য়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি জানি, চাঁদা তুলে দুর্গাকালীশনিপুজো হ'তে পারে, কিন্তু একটা ছোট কাগজ ওভাবে চালানো কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। অথচ, এই কাজটা আবার আমাকে দিয়ে একদমই হয়না। ফলে, আমি কি করবো, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলামনা। এই অবস্থায় আমার দুই অলৌকিক বন্ধু সহচর শৈলেন দত্ত ও রবিন পাল আমাকে প্রায় চমকে দিয়েই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দুর্বহ দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন।

তখন শীত প্রায় শেষ। অজ্ঞাতবাস বের হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

আরো কয়েকটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। ১) প্রতিবছর একজন কবিকে পত্রিকার পক্ষ থেকে 'অজ্ঞাতবাস পুরস্কার' দেওয়া হবে। পরবর্তী সংখ্যা অজ্ঞাতবাস ঃ ১৯ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হবে। ওই সংখ্যাতেই আমরা ১৯৮৩-র পুরস্কৃত কবির নাম ঘোষণা করবো। একটি পরিচ্ছন্ন কবিসম্মেলনের মাধ্যমে আমরা ওই পুরস্কার পুরস্কৃত কবির হাতে তুলে দেবো। গত দু-চার বছর ধ'রে যাঁরা লিখছেন—কেবলমাত্র সেইসব তরুণ-তরুণীই পুরস্কারের জন্যে বিবেচ্য হবেন। স্মরণ করা যেতে পারে, কৃত্তিবাস একদা এই ধরনের পুরস্কার চালু ক'রেছিলেন। এছাড়া ২) তিন দশকের (পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর) কবিতার ওপর দীর্ঘ তথ্যমূলক সর্বাঙ্গীন আলোচনা পরবর্তী তিনটি সংখ্যায় থাকবে। লিখবেন আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত তিনজন। এখনই তাঁদের নাম বলা যাচ্ছে না। ৩) একদা যাদবপুর প্রিন্টিং টেকনোলজির ছাত্র, আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আশুতোষ চক্রবর্তী

লিখবেন বাংলা টাইপোগ্রাফির ওপর একটি অসাধারণ আধিদৈবিক রচনা, পরবর্তী কোনো সংখ্যায়, যা বাংলা টাইপোগ্রাফিকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে। ৪) তরুণ কবি ও চলচ্চিত্রকারদের গল্প নিয়ে আরো একটি সংখ্যা বের হবে। এছাড়া ৫) 'সাম্প্রতিক কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা'—এই বিষয়টিও আমরা কণ্টিনিউ করবো। লিখবেন মূলতঃ তরুণ কবিরাই। এই আর কি—

অরুণ বসু

পুনশ্চ। সুবোধ সরকারের 'কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গে কিছু কথা'য় লিখিত অলোকরঞ্জনের কবিতা বিষয়ে লেখক এক জায়গায় রাধারমণ মিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, রাধিকামোহন মৈত্র সম্পর্কে অলোকরঞ্জনের অনুরূপ একটি পদ্য-পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অথচ, সন্দেহ নিরসনের জন্য সুবোধের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না ব'লেই এই অবতারণা।

অজ্ঞাতবাস লেখা চায়, প্রথাবিরুদ্ধ ভালো লেখা
নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকলে
অজ্ঞাতবাসে লেখা পাঠাবেন না

পুনর্মুদ্রণ

সমারূঢ় জীবনানন্দ দাশ

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভনিতা ঃ
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

যাও পাখি নিত্য মালাকার

যাও পাখি, উড়ে যাও কুৎসা রটনার মেঘ, বলো—অনুভব

পড়েছিলো কিছু ভাঁড় উচ্ছিষ্ট সিগ্রেট কিছু, খড়কুটো
পোড়া দেশলাই কাঠি, মুখ নিচু ঘাস
কাকজোছনার নিচে শপথ-প্রতিজ্ঞা রোধ, হাততোলা
গোপন ইন্ধন
পড়েছিলো চিরকুট, হয়তো বা মাকে লেখা—বোঝাপড়া
বিশ্বাসের গভীর নিঃশ্বাস
ছিলো ওত্, বড়-চোখ লুকোনো নির্দেশ পথ,

কাকজোছনার নিচে শালবন, রাঢ়দেশে ছায়াবীথি,
রণঘোরনীতি আর নৈশভোজ ধূমপান, উৎসর্গ জীবন
যৌবনের শীত ছিলো, শাসন কামড় ছিলো মধ্যরাতে,
কুজ্ঝটিকা ছিলো কিছু
ভোর হতো খুব ধীরে, হুইশিল শোনা যেতো—
পাতায় মর্মর ধ্বনি, দূরে দূরে কাঁটাঝোপ
সারাদিন কেটে যেতো, বিকেলে জাফরি রোদ
গোধূলির সাঁঝতান, ঝিঁ-ঝির সঙ্গীত
এক কাঠবিড়ালীর সাথে হয়েছিলো পরিচয়,
মাঝে মাঝে ঘুরে যেতো—
অতিথি ও সাংবাদিক
কলকাতার খবর এসে দিয়ে যেতো চিড়েগুড়, বিড়ি ও আগুন

সহসা এপ্রিলে,
পূর্ণিমায় বিয়ে বাড়ি একদিন বসে গেলো
তাঁবুর বসত কাঁটা ঘেরা জাল,
হুতোমের মাঠে—
কুচ ও ত্রি-সন্ধ্যা জুড়ে কার্যক্রম, ঘন ঘন বাঁশির ফুৎকার,
কোনোদিন উড়ে যেতো
ছমছম্ করে উঠতো, কাঠবিড়ালী চলে যেতো,—
ইঁদুর সুড়ঙ্গ থেকে

কিছুদিন পর,
ঘুম থেকে জেগে উঠলো গা-মোড়ানোর হাই,
মেদসিক্ত ফণা
বেয়নেট এগিয়ে আসলো, পাত-পিঁড়ি উচ্ছিষ্ট
থাকলো পড়ে
কাকজোছনার নিচে শালবন, পোড়া ঘাস,
রণঘোর বিরহ আষাঢ়
এসেছিলো একদিন জীবনের বলাধান,
সেই কতোদিন আগে—
দারুণ সংঘাত।

একটি প্রেমের কবিতা

তোমার মুখের পাশে শাদা ঘ্রাণ মৃত এক নক্ষত্রের আলো,
তোমার ঊরুতে বিষ, স্বপ্নের কামুক রেশ রয়ে গেছে আজো
হয়তো আমার নয়, তবু আমি অইখানে গিয়েছি মায়ায়
বশ্য শিকারের কাছে—ওত্ পেতে কিছু ভুল তুলে এনে
দেখেছি জীবন
হয়তো বিন্দুর মতো, জলের দাগের মতো পানের পরের এই
গেলাসের স্মৃতি
লেগে আছে শাদা ঘ্রাণ আমারো নাভির নিচে, ওষ্ঠে নয়
—তরবারি, কুসুম আঘাত
মদির যন্ত্রণা বুঝি হয়তো প্রেমের মতো কিংবা শুধু ঘাসের মতোই
সবুজ ফড়িং বুঝি বসেছিলো একদিন গোপন রক্তের খাঁজে
তারই দাগ, জলধারা—ম্লান ও হলুদ দুই পাতায় বাতাস
বয়ে গেছে বহুকাল শীতল শব্দের স্রোত, ঋতুরঙ
সুর ও মূর্ছনা
গভীর গুহার তল, হা-মুখ শিশুর চোখে
মায়াহরিণীর মতো আড়ালে জীবন
নেমেছিলো পদছাপ, চোখ আর মেঘনিচু আকাশের
সবুজ আঁধার
একদিন অইভাবে, মানুষের মতো নয়—তবু
শিকারের খেলাছলে তুলে নিতে শান্তরস
প্রতিশ্রুতিহীন যেন তোমারি ভেতরে মগ্ন,
ঘাসে ও গেলাসে।

এই অবিরল বেঁচে থাকা—৩

জাগো নদী, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি বন-বাড়ি প্রহরী সেপাই ?
সব ঘুমে অচেতন, শুধু একা আমি জেগে আছি
কুশকাঁটা হাতে নিয়ে—লাল বল উল,
আমি জানিনা আগ্রহ তবু
আমাকে জাগিয়ে রাখে, শান্ত হতে উপদেশ দ্যায়
উত্তুরে বাতাস এসে আমাকে সংযমী করে,
শিক্ষা দ্যায় কিছু
আমি জেগে থাকি বাতি জ্বেলে—দুহাতে আড়াল
আমি শিখেছি কর্তব্যনীতি,
আমার মৃত্যুর পর আরো
আমি বেঁচে থাকবো যদি না সত্য উল্টে যায় মাঝপথে,
পৃথিবীর বিবমিষা মহাপয়ারের লোভে উদগ্রীব
অতল ব্রহ্মাণ্ডলোকে চলে যেতে চায়, তার টান
আমাকে জাগিয়ে রাখে অজস্র শিশুর হাত
অভিবাদনের মতো
আমার সুড়ঙ্গপথে জেগে থাকে অন্ধসত্য,
কারাগার থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই কি কখনো ?
অনশনপ্রিয় আমি ভাতরসে পরাঙ্মুখ, শুধু
জিজ্ঞাসার মতো উদগ্রীব
মুণ্ডু নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছি—হাতে কুশকাঁটা,
আমাকে বাঁচিয়ে রাখো
চরাচর, হে নিখিল জঠরাগ্নি সহোদর বায়ু।

এই অবিরল বেঁচে থাকা—৪

আমি লিখি আমার জীবন, ক্রোধবশীভূত
আমার কবিতা লেখা যাচ্ছেতাই,
আমার ঘৃণার বিকল্প ঐ বিষণ্ণতা বাতাসী প্রলাপ,
আমি ভেঙে ফেলতে চাই মধুস্রাব পদ্য লেখা, রমণীরমণ
আমি ছাঁড়িয়ে ছিটিয়ে যাই অবশিষ্ট আমার বঞ্চনা

একদিন অন্ধ হবো, নড়বড়ে হাঁটু নিয়ে লাঠি হাতে
ঐ শিশুটির
চোখ থেকে চিনে নেবো খানাখন্দ—কৃপাভিক্ষা,
আরো কতোদিন
খেলে যাবে পাখিরা মায়ের কোলে পৃথিবীতে, আহ্
আমি ভাবতে পারিনা,
ঠিক কোন্ মাঠে উড়ে বসবে শকুন বিমান
ক'টা সৈনিক পিঁপড়ে টানতে থাকবে আমার দু'হাত ঠ্যাং
মুণ্ডু ও কলিজা,
জলের কুমীরও এসে ভাগ নেবে ? কথা ছিলো
প্রতিশ্রুতি ছিলো ঐ ছাতিমের কাছে,
একদিন বয়ে যাবে শিরশিরে হাওয়া স্রোত,
ব্রহ্মদৈত্যের হা-হা হাসি
পদ্যের খাতা জাবনা খড়ভুসি খেয়ে ফেলবে
আমার মহিলা, শিশু
আমি রেখে যাবো না কিছুই ?

একগুচ্ছ কবিতা

তস্কর পালালো মল্লিকা সেনগুপ্ত

এরণ্ড পাতায় শুয়ে রোদ পোয়াতেন ময়ূরাক্ষী।
তখন নগরপাল রাজ-কোষাগার থেকে ফিরছেন দিক্‌চক্রবালে—
গৃহস্থ কপোত উড়ে উড়ে আড়াল মাপতে চায় মাঝখানে

বিজিত চূড়ার দিকে আর ফিরবো না।

এবার আমার জন্য সোনার অজিন আশো—নতুন ভৃঙ্গার
শরীরে আলস্য ভেঙ্গে উঠে বসলেন ময়ূরাক্ষী
তার খাদ ও পর্বত ছুঁতে এসে পিছলে গেল রোদ

শুধু নগরপালের শিথিল মুঠি খুলে পালালো তস্কর।

দুই পুত্র

দুই পুত্র ;
জঠরের রুদ্ধ কোষ থেকে ছিটকে পড়লো আগ্নেয়পাথর
তখন আঘাত তাকে ছিধা করে নিলো
লাভাস্রোত গড়িয়ে পড়লো মাঝখানে, ঘাসে

আমার দু'পুত্র আজ মুখোমুখি উদ্ধত হয়েছে।

এবার মায়ের চোখ অন্ধ কর্ অগ্নিশলাকায়
এই পৃথিবীর দৃশ্য আর আমি দেখতে চাই না
অসির আঘাতে তোরা বাম ও দক্ষিণ স্তন ভাগ করে নিয়ে
আমাকে নিষ্কৃতি দিস,

দুইপুত্র মুখোমুখি উদ্ধত হয়েছে।

স্খলন, সমুদ্র পাহাড়ে

তুমি কিনে দিলে সৈকতের ধারে ঘুরে বেরোনোর রাত্রিবাস ও মৌচাক—এই নিয়ে শুরু হোক গন্ধর্বলোকের সংসার। টুপিতে বরফকুচি, এম জি সিক্সটিন কাঁধে নিয়ে নেফাসীমান্তের সেণ্ট্রি ঘরে ফিরবে। কবে কার বীরত্বে খুশী হয়েছিলেন রাজা-বাদশারা, বংশানুক্রমিক পানপাত্রে তার ভরে উঠবে কিসমিস রঙের মদ—ফেনা ফেনা ফেনা—তার নিচে সামুদ্রিক কাঁকড়ার ঘোরাফেরা। এই হিমালয়ে ঈশ্বর থাকেন সহচরী পরিবৃত, উর্বশী ঘুরে ঘুরে ঋষিদের তপস্যা ভাঙান। এখানে শয়তান নেই, মার তার তিন কন্যা সহ বছরে একবার ঘুরে আসে।
এখানে জন্মায় যারা তারা দেবশিশু। তাদের পিতারা শুধু একবার স্খলিত হয় সম্বৎসরে।

রাজহাঁস

নিষেধে আড়ালে অঙ্ক কি করে জানতে পারো রাজহাঁস ? যদি তীক্ষ্ণ হয় চঞ্চু, আমার কঙ্কনাল ঠুকরে খুঁড়ে আনো যা কিছু দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান, যদি কিছু শিল্প অবশিষ্ট থেকে থাকে আজও। অন্যথায় শুক্লাপঞ্চমীতে আত্মহত্যা ঠেকাতে পারবে না তুমি। সূচ শিশির বিন্দুর মতো ফুটে উঠে দ্বক নীল করে দেবে প্রাচীন উল্কিতে। মরে যাবো আমি।

পাদুকা গৌতম বসু

গ্রীষ্মের সেই অপার সেতুর উপর তাকে
পুনরায় দেখা গেলো, ছায়াহীন, নক্ষত্রসমান ;
আবার চোখের পাতা পুড়ে ওঠার দিন, অবগুণ্ঠন,
বৃক্ষজটিল পথে আগুন গড়ায়, কাঁথা পবিত্র জেনে
কাঁথার উপরের ও নিচের শূন্যতাকে প্রণামের সময়
আগুনের বসনকামনা, আগুনের কলা, মাথা কোটে,
এই পথে বাতাসের কারিগর চিরতরে চলে গেছে।

মৃত্যুভয়ে সন্ন্যাসীও কাঁদে অরুণ সাধুখাঁ

পুকুরের পাড় থেকে উঠে আসে অদ্ভুত হলুদ চাঁদ গ্রহণের শেষে
মৃত্যুভয়ে সন্ন্যাসীও কাঁদে অসহায়
কেউ নাকি তাকে ফেলে দেবে সেই স্রোতে যা আসে শিবের জটা থেকে

মৃত্যুভয়ে সন্ন্যাসীও কাঁদে অথচ জীবন তার কাছে অর্থহীন ব্রহ্ম ছাড়া
নিরালম্ব চন্দ্রভূক প্রাণ চায় সবুজ ঘাসের মাটি
শহরের কালো পীচে
মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে দড়ির ওপর
সেই দড়ি কখনো সখনো রজ্জু হয় ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা পেরেক
দিয়ে শান্ত যিশু খুন

হাজার বারেক যার সান্ত্বনা চেয়েছি পায়ে ধরে
সেই নারী ঠোঁটে তুলে দিয়েছে অজস্র ধুতরো জ্যোৎস্না

ঘুমোও ঘুমোও পাখি, এই সেই ঘর, সারারাত ব্রীজ ভেঙে
ঠিকানা মিলেছে
তবু সংশয় অদ্ভুত,
চাঁদ সারারাত ভালবাসে মৃত্যুবৎ জেগে থাকা ঘুম।

আমার ভারতবর্ষ রতনতনু বাটী

আমার ভারতবর্ষ নামের মেয়েটি উপুড় করে দিয়েছে তার জীবন
এবার জলে টলোমলো করে দাও খরার স্বদেশ !
ধানের ভেতর দ্রিমি দ্রিমি করে উঠছে জরদ্‌গব অন্ধকার
খুব শূন্যে আকুলি বিকুলি করছেন অনন্তের হাওয়া
তুমি কর্ণের মতো ঘাড় গুঁজে বসে আছো কেন সারাদিন ?
আমি এর আঁধি ও আঁধার একটুও বুঝতে পারছিনা !

আজ সারাদিন ঘরকুনো মানুষের মতো বৃষ্টি হলো
তাই নিভু নিভু তেরছা চাঁদের নিচে ক্ষুধাকাতর আমরা
পাত পেড়ে গোল হয়ে বসে আছি—
সহসা আমাদের মাঝখানে একখানা ভারতবর্ষ দিয়ে
তুমি বললে, তোমরা সব ভাগ করে খাও।

গ্রাম নির্মল হালদার

আমার শিরা উপশিরা বুনেছি
পাতায় পাতায়
যে পাতাই ছিঁড়ে ফেলবে
শিরা উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়বে
টুপ্‌টাপ্‌
আমার শিরা উপশিরা দিয়ে বুনেছি
একশো আটটা পথের সঙ্গে
একশো আটটা গ্রাম
ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলবে গ্রাম
পাপড়ির নিচে নিঃশ্বাস, পাপড়ির উপরে
নিঃশ্বাস, ছিঁড়ে ফেললেই
আমার মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে জড়ো হবে পিঁপড়েরা

দুটি কবিতা মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য

তোমাকে

তুমিই সেই ধন্য নারী
যাকে আমি অবলীলায়
শান্ত স্বরে বলতে পারি
—এসো এখন। মগ্ন হবো
শরীর খেলায়।
বন্দী হবো তোমার ভিতর
উজাড় প্রেমের গোপন শিকড়
বাড়বে যখন রৌদ্রছায়ায়
ভাসিয়ে দিও তোমার মায়ায়।

আবার আমি পুরুষ গলায়
কঠিন স্বরে অবহেলায়
বলতে পারি—থামো এখন।
টলটলে চোখ
দেখেও নীরব থাকতে পারি।

তুমিই সেই ধন্য নারী
যাকে আমি রিক্ত গলায়
ছুটির দিনে অলসবেলায়
হঠাৎ যদি প্রশ্ন করি
এই কি জীবন ?
নাকি এই-ই জীবন

তুমি কিছু বলতে পারো।

শুধু তোমাকে

তুমিই সেই বিশাল পুরুষ
মহীরুহ। তোমার ছায়ায়
আমার কেমন বেড়ে ওঠা
ভালবাসার অলীক মায়ায়।

শরীর জুড়ে বর্ষা নামাও
উর্বরতা উপড়ে আনো
গোপন ধারায় ঝর্ণা ঝরাও
আমার শুধুই নীরব গ্রহণ।

কিন্তু যেদিন মহীরুহ
দিন যাপনের ভুল বাতাসে
একা একাই দুলব ভেসে
দ্বৈত প্রেমের কঠিন ফাঁসে
সেদিন তুমি কাছেই থেকো
তোমায় কিছু বলার আছে।

বিপ্লবের জন্ম সিদ্ধার্থ বসু

চাওয়ার নয়, শুধু দেখে-যাওয়ার জীবনে
প্রতিষ্ঠান বিরোধী কিনা জানিনা কিন্তু নিজস্ব মৌলিক
একটিবার অন্ততঃ 'না' বলে ওঠো।

বাস্তবতা সব নয় জেনো এমনকি বর্ণনায়
জরিপের ফিতে হাতে যাবো না শস্যের কাছে
অকারণ তুমি চায়ের পেয়ালা চুমুকে কেঁদেছিলে
অকারণ তুমি পরের ছেলে কোলে হেসেছিলে
বেতের চেয়ার থেকে উঠে-যাওয়ার শূন্যতায়
পুরোনো বন্ধু আজ নতুন হয়ে যুগলে এলো
বৈশাখে বিয়ের তারিখ এখানে কি প্রাসঙ্গিক
কি মর্মে পুরুষেরা ভোরের পথে নানে ভাগ্য অন্বেষণে

চাওয়ার নয়, শুধু দেখে যাওয়ার জীবনে
একটি 'না' থেকে জন্ম নেবে কবে অনেক
অনেক মানুষের-ই—'না, না, না,···'।

কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গে কিছু কথা সুবোধ সরকার

একদিন ছিল কবিতা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতো। কবিতা ক্যাথিড্রালের নিচে দাঁড়িয়ে পড়া হত। কবিতা ছিল রাজার, রাষ্ট্রের, ভাঁড় ও সুন্দরীদের বর্ণণা। খুবই অনিবার্য কথা, যখন অলোকরঞ্জন বলেন এই গ্রহের জন্মদিনে ছিল কবিতা, মৃত্যুদিন পর্যন্ত থাকবে এই কবিতা। রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা তার আকার ও আদর্শ পাল্টাচ্ছে। একদিন কি করে একটি মেয়ের জন্য সমগ্র দেশবাসী যুদ্ধ করেছে ১০ বছর, তার অমর কথা লিখে গেছে হোমর ; আজ এলিয়ট বলছেন—'দিস ইজ দা ওয়ে, দা ওয়ল্ড্ এণ্ডস্'। অন্যায়, ক্ষুধা, অত্যাচার, অপমান সেদিনও ছিল,আজও আছে—শুধু তাকে প্রকাশ করার ধরণ কখনো এগিয়ে গিয়েছে, কখনো পিছিয়েও এসেছে আবার।

এখন মহাকাব্য লেখা হয়, সেকথা শোনা যায়না। ব্যতিক্রমের কথা তুলছি না। কবিতার আকারও হয়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত, যেন একটি এপিগ্রামের বিস্তার। জামা পড়তে যতটা সময় লাগে তার চাইতে হয়ত একটু বেশি। আমার এই গদ্যের জন্য বেছে নিয়েছি কয়েকটি কবিতা যার মধ্যে সবচেয়ে বড় লেখাটি পাতা দুয়েকের—সবচেয়ে ছোটটির আয়তন পাঁচ লাইনের। কবি এখানে যতটা উল্লেখ্য, তাঁর থেকে অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় তার কীর্তি। এই কবিতাগুলি এসেছে নিজের জোরে, কোনো নায়ক-বন্দনা এর পেছনে কাজ করেনি।

যে কবিতাগুলো আমি বেছেছি তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই হয়ত বেশি। এরকমও নয় যে তারা বাংলা কবিতার এক একটি শাখা-কে ইঙ্গিত করছে, বরং এরা সমবেতভাবে ধরিয়ে দিচ্ছে বাংলা কবিতা, একটি বিশেষ সময়-সীমার ভিতর কত বিভিন্ন ও বিপ্রতীপভাবে বেড়ে উঠেছিল। কত তির্যক ও তাজা, নম্র ও উশৃঙ্খল, আবিল ও অব্যর্থ হয়ে উঠেছে একটি সময়ের কবিতা—তারই দূরাভাষ হয়ত মিলবে এই অসম্পূর্ণ গদ্যটিতে।

এখানে রয়েছে 'নীরা ও জিয়ো আওয়ারের' মতো পবিত্র কবিতা, আছে 'প্রহর'-এর মতো কাতর এবং 'রাক্ষস'-এর মতো সাহসী কবিতা, রয়েছে 'আদিগন্ত'-র মতো প্রায় বিধুর, জাগ্রত এবং 'ভিক্ষাই মনীষা'-র মতো শুদ্ধ, সংরক্ত কবিতা, 'রহস্য'-র মতো নিরঞ্জন এবং 'নির্বাসন'-এর মতো বিবেকবান, সরাসরি কবিতা যেমন আছে, আছে 'জন্মেছিলাম'র-এর মতো নিঃস্ব, নিরাশ্রয়, শোণিতসিক্ত কবিতাও।

যার স্মৃতি প্রত্যারক নয়, কবিতাগুলোর নাম দেখে নিশ্চিত ধরতে পারছেন কারা হলেন এই লেখকবৃন্দ। খুব সহজে অনুমান করা যায় কোন সময়-সীমার কথা উল্লেখ করতে চাইছি আমি।

'নীরা ও জিরো আওয়ার' কবিতাটির লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এতো চপল ও পবিত্র কবিতা বাংলা ভাষায় খুব কম লেখা হয়েছে। এতো ছটফটে ও গভীর, এতো রাগী, সরল ও কামাতুর লেখা খুব একটা চোখে পড়ে না। কবিতাটির সারে যে কোনো স্পর্শকাতর পাঠক স্বেদ ও শোণিতের গন্ধ পাবেন। নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা নিগ্রোদের মতো কবি ভালবাসতে পারেন, এবং আশ্চর্য এই সে-ব্যাপারে কবির কোনো লজ্জা নেই, শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের লজ্জা চিরকালই একটু কম। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সংবাদপত্রের জল-মেশানো গদ্য এগুলি সবই লেখেন কবি, সেটা তাঁর ব্যাপার, তবু তার থেকে একটা সরাসরি মুক্তির আর্তিও তার রচনায় থেকে যায়। রাজতন্ত্রকে লেখক নিন্দা করছেন—এক বিরাট প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি থুতু ফেলেন যেখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের আরম্ভ।

পাঠক নিশ্চয় জানেন 'নীরা ও জিরো আওয়ার' একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতা, কিন্তু এর এমনই বিক্রম যে এ এর সীমিত পরিসরে আত্মসাৎ করে নিতে পারে রাজতন্ত্র থেকে গীতার প্রসঙ্গ পর্যন্ত।

নীরা তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়েছি শোবার ;
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে।
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া লেগে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়...

সাবান কোনো প্রতীক নয়, শুধুই সাবান, দোকান থেকে কিনে আনা। কিন্তু যে বর্ণনার ভেতর সে এসে পড়ে, সেখানে সে হয়ে ওঠে এক অনির্বচনীয়ের আর্তি, এক বাসনার বিকল্প, যেন নিজেকে চরিতার্থ করে নেবার উদ্যোগ। কবিতার একটা দিক কবির হাতের ভেতরেই থাকে, আর একটা দিক এতো অন্ধকার বা জ্যোতির্ময় যে চিরদিনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক জড় ও চেতনার সংস্থান। আর তাঁকে নিয়েই কবির যত মাথাব্যথা, হাতজ্ঞান, যুক্তি, যুক্তিহীনতা। হয়ত নাগালের বাইরে বলেই তাকে এক একজন এক একরকম চোখে দেখেন, ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু কখনো কখনো সেই পরমার্থ থেকে এক ঝলক দ্যুতি হয়ত ছিটকে নেমে আসে মানুষের মরজগতে। এখানে সাবান সারা শরীর জুড়ে, যৌনাচারে নয়, এক দুজ্ঞেয়, কালজয়ী জাগো জেগে ওঠে তখন কারোরই হুঁশ থাকার কথা নয় শরীর মর না অমর, সেই ঘোর থেকেই কবি কি বলেন ঠিক থাকে না—'তোমার শরীর যেন অমর না হয়'। অনেক সময় অর্থের দিক থেকে বিভ্রান্তিকর হয়েও স্মৃতির অমোঘতায় কোনো পংক্তি হয়ে ওঠে স্মরণীয়। এটি তার চূড়ান্ত উদাহরণ। তার শরীর যেন অমর হয়ে ওঠে এই চাওয়াটাই কি বেশি জরুরী ছিল না ? সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘুরিয়ে বলবার চাতুরকলা দরকার পড়ে না। কথা সোজা করে বলবার এমন এক সাহস ও আত্মপ্রত্যয় এই কবির আছে যে কখনো কখনো প্রাক্তন ন্যারেটিভের ঝুঁকি নিয়ে নেন। তাতে কখনো কখনো লাফ দিয়ে কবিতা উঠে যায় দুর্নিরীক্ষে, কিন্তু কবি নিজেও জানেন হয়ত সব সময় তা ঘটে না।

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহানাপুরের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশান ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রুকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না।

যদি অনুযোগ করি এই স্তবকে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় একটু বেশী গল্প করে ফেললেন, তবে কি ভুল বলা হবে খুব ? সাহানাপুরের দোকান, বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশান, প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ, ফরিদপুরের ছেলে, কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে আলজিভ দেখানো—এসব প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও কারোর পড়তে নিশ্চয় খারাপ লাগে না। আমি যতবার কবিতাটি পড়েছি বারবার মনে হয়েছে এটিই কবিতাটির একমাত্র দুর্বল জায়গা। এতো বলবার কি দরকার ছিল ? কিন্তু ঠিক তারপরেই 'ডিনারের আগে ১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডেভিট মহাশূন্যে উড়ে যায়...' পর থেকেই পরপর এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে, এমন সব পবিত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে বোঝা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় পৌঁছবার আগে দরকার ছিল ঐ আপাতশিথিল পরিবেশ। যদি পাঠক লক্ষ্য করেন তো দেখবেন আগের স্তবকে ছিল সাহানাপুরের দোকান, এখানে এসেছে হোয়াইট, ম্যাকডেভিট ও মহাশূন্য, আগের স্তবকে ছিল ইঞ্জেকশনের প্রসঙ্গ, এখানে এসেছে বিপরীত অংক এবং গীতার প্রসঙ্গ, আগে ছিল নিম্ন শরীরের যন্ত্রণার কথা (প্রসঙ্গত জানাই কবিতাটি থেকে এই লাইনটি আমি বাদ দিয়ে পড়ে থাকি, সাবান দিয়ে অতো সুন্দর দৃশ্যবর্ণনার পর এ ধরনের পংক্তি অবান্তর বলে মনে হয়)। ৯, ৮, ৭, ৬, ৫...এই বিপরীত গণিতের বীজ থেকে শুরু করে মহাশূন্যের ওপর দিয়ে ওপেনহাইমারের জগৎ স্পর্শ করে যে জগতে এসে কবি প্রবেশ করেন তা অতীব পার্থিব, সেখানেই অজ্ঞান হবার আগে সশব্দ অভ্যুত্থান—সেখানেই দুরারোগ্য নেশা—নীরা। কবিতাটির শেষ অংশ একজন মৃতব্যক্তিকে শোনালেও সে কবর থেকে উঠে আসবে। মন্ত্রের সমান এই প্রেমের কবিতা দিগ্বিজয় করার ক্ষমতা রাখে। প্রেমের কবিতা যত কম লেখা যায়, তত ভালো—এই ভুবনবিখ্যাত উপদেশ, যুবজোতাদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু এই কবির সমস্যা অন্য জায়গায়। কারো কারো যেমন দুরূহতার প্রতি এক দুর্বার স্পর্শকাতরতা থাকে, তেমনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অতি-

সরলীকরণের প্রতি ঝোঁক কোনোভাবেই শুভলক্ষণ বলে মনে হয়না। প্রেমের কবিতায় সেটি দ্বিগুণ বিপজ্জনক।

'ত্রিতাল'—গতবছর প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল'-এর প্রথম কবিতা। সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। অনেক আগেই একথা আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। একথা উঠছে কেন? তবে কি এমন কবিতা আমরা সরলমনে গ্রহণ করে থাকি যেগুলো মিথ্যাচারে কুণ্ঠিত নয়? 'কবিতার সত্যে আমি একঝলক মিথ্যের বাতাস/লাগাই, কী পাল্টে যায় কবিতার সত্য একদিন/তাহলে সত্যের নেই সেই বুঝ, সেই দাঁড়সাঁতার/সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুখাঘাস'। (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) এরকম কথা যখন ওঠে তখন কি একে 'অবাধ প্রগল্‌ভতা' বলে ছেড়ে দেব? সত্য 'শতাব্দীর একতীরে বসে শোনে অন্য তীরে তাল পড়ে ভাদ্রমাসে।' শঙ্খ ঘোষ সত্য ছাড়া অন্য কিছু লেখেন না, এ ব্যাপারে অনেকের মনেই রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, কিন্তু 'মন্থর পুনরাবৃত্তি' নেই কোথাও—একথা কজন মেনে নেবেন? তাঁর সব কবিতার মূলেই রয়েছে এক শূন্যতা। কিন্তু কলঙ্কের যেমন, তেমনিই শুচিতার ভেতরও রয়েছে এক শ্বাসরোধ-কারী অস্বস্তি। কিন্তু এইসব অতিক্রম করে তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে নির্ধারিত সীমার বাইরে চলে যায়। যেমন এই কবিতাটি—

ত্রিতাল

তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু
শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু
বুকে কুঠার সইতে পারা ছাড়া
পাতালমুখ হঠাৎ খুলে গেলে
দুধারে হাত ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, এই
শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া।

শ্মশান থেকে শ্মশানে দেয় ছুঁড়ে
তোমারই ওই টুকরো-করা-শরীর
দুঃসময়ে তখন তুমি জানো
হলুকা নয়, জীবন বোনে জরি
তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন
প্রহরজোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা
মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই
কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল।

এইধরনের প্রাতঃস্মরণীয় কবিতা শঙ্খ ঘোষ আগেও লিখেছেন। একেবারে প্রথম পাঠেই এর কম্পিনিয়ান কবিতাটি, যেটি সহজেই মনে আসে তার নাম 'তক্ষক' (বাবরের প্রার্থনা) আমি কবিতা দুটির শুধু বাক্যগঠনের মিলের দিক্ থেকে বলছি না, আত্মার দিক্ থেকেও এরা প্রায় একে অন্যের পরিপূরক। যেন দুদিক থেকে দেখতে চাইছেন একটি পূর্ণ মানুষকে, যার কোনো দৃষ্টি নেই, শ্রুতি নেই, কেবল সত্তা। খুবই আত্মপ্রদর্শনকামী এই কবিতাটি। খুবই ভালো লাগে কবি যখন নিজের কথা ছাড়া, তা হোক্ না সীমিত, অন্যকিছু ভাবতে পারেননা বিপদকালে সে অর্ধেক রেখে, অর্ধেক দেয় ছেড়ে শাস্ত্রে তাকেই বলেছে প্রাজ্ঞ, কর্মঠ আর সৎ—এ ধরনের সরাসরি বিবৃতি পড়তেও কোনো আপত্তি নেই আমার কিন্তু বিবৃতি রচনা কোনো মহৎ কবির কাজ হতে পারে না। এই কবির নিজের দুঃখের ভেতর থেকেই আভাসে ইঙ্গিতে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত সময়ের ছবি। 'শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া/তোমার কোনো ধর্ম নেই'—এখানে যেন ভিতরে ভিতরে নিঃস্ব অসহায় কোনো মানুষের আর্তধ্বনি রুদ্ধ হয়ে আছে যার আশ্রয় আত্মসমর্পণ, আত্মবর্জন নয়। এতটাই মানবিক এর প্রহার।

জন্মেছিলাম

জন্মেছিলাম; এখনো বেঁচে আছি;
এছাড়া সবই রৌদ্র সবই তুষার—
মিছিল থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে পাগল
বাগানে নীল মাছি।
জন্মেছিলাম; জন্ম হয়েছিল;
এখনো বেঁচে আছি॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতার ইতিহাস সমস্ত যার নিজের ভিতর আত্মসাৎ করে সহ্য করার ইতিহাস। কোনো এলোমেলো, অবিন্যস্ত, ঘটনাবহুল জীবনের দিকে তাঁর কবিতা জ্বলে ওঠে না। চারপাশ খুব থমথমে, নিথর। পাতা ঝরার শব্দ, ঘটনা বলতে বড়জোর মাঝে মাঝে কয়েকটা কমবয়সী ছেলেমেয়ে সাইকেল চড়ে যাদবপুরের পথ দিয়ে চলে যায়।

প্রকরণ যখন নিজের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ কবিতার আত্মার ওপর ছেড়ে দেয়, আঁকড়ে ধরতে চায়না এমনকি কোনো মার্জনীয় অলঙ্কারকেও—তখনই এমন নিরাসক্ত অথচ অমোঘ কবিতা লেখা সম্ভব। 'জন্মেছিলাম' নামটির ভেতরেও যেন লুকিয়ে রয়েছে একটা গা এলানো ভাব। কোনো আত্মপ্রদর্শনের চাপ নেই কবির। যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে তো ভালো, না করলে খুব একটা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কবিতাটি আমার কাছে এতো মূল্যবান কেন তার একটা জবাব আমার আছে। ভালো কবিতা যখনই পড়েছি তা আর্যযুগেরই হোক্ বা এলিয়েটের হোক্—দেখেছি সব অসাধারণ কল্পনা বিস্তার, ইমেজ, মেটাফার, কন্‌সিট। কিন্তু এই সমস্ত উপকরণ বাদ দিয়ে, দুঃসাহসিক ভাবে রিক্ত হয়েও কতো ভালো কবিতা লেখা যায়,

'জন্মেছিলাম' তারই উদাহরণ। জন্মেছিলাম, বেঁচে আছি এই সংবাদের জন্য কবিতা পড়তে হবে কেন? এরকম প্রশ্ন কেউ তুলতেই পারেন, তাতে অন্যায়ও কিছু দেখিনা। শুধুমাত্র এই সাধারণ খবরটা পৌছে দেবার জন্যই কি প্রণবেন্দু লিখেছেন এই কবিতাটি? কিন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয় একটু সজাগ রাখলেই ধরা যায় এই অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা, এক অতি আর্ত, সহিষ্ণু মানুষের দুঃখ জয়ের সম্মান। যেন মনে হয় বহুদিন আগে কোনো সর্বনাশ হয়ে গেছে অলক্ষ্যে, আজও তার চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

মীমাংসার জন্য নয়, নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্য অন্তত এটাও ভেবে দেখা দরকার কবিতার কাছে আমরা বারবার ফিরে আসি কেন? এরকম নয় কি যে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে আমাদের উপলব্ধি, আর আমরা দর্শনের বদলে খুঁজতে থাকি একটু সামান্য শান্তি, রাষ্ট্রনায়কের মেধাবী ভাষণের বদলে ভীত, কম্পমান, বিধুর, ব্যর্থ জীবনের মনোলগ। সেই ফিসফাস যদি কেউ শোনো ভালো, না শুনলেও ক্ষতি নেই। এই এক জায়গা যেখানে উত্থানও নেই, পতনও আপেক্ষিক। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা পড়তে পড়তে আমার এই ধরনের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা কাজ করে।

ভিক্ষাই মনীষা

ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, মা আমাকে দাও
একমুঠি অন্ন কিংবা রুটি কিংবা মৌন নীল জল
শুকনো প্রাণ নিয়ে আমি বহুদিন জীবন্ত ভিক্ষুক!
কিন্তু তা কী করে হবে? সে আমার পছন্দ প্রাক্তন
সে আমার প্রেম কিংবা আমি তার শান্ত কুয়োতলা
যোগাযোগ ছাড়া যেন নদী হিম, উজ্জ্বল, প্রখর
ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, ভিখারি তোমাকে
একদিন ভালবাসতো, আজ তার ভিক্ষাই মনীষা ॥

কে যেন বলেছিল রবীন্দ্রনাথও এতো কবিতা লেখেননি। এই কৌতুক আমার কাছে শুধু পরিসংখ্যান নয়, তাৎপর্যপূর্ণও বটে। ভালো কবিতার পাশাপাশি খারাপ কবিতা অবলীলাক্রমে এই বয়সেও আর কোনো কবি লিখেছেন কিনা—আমি জানিনা। প্রতিভা কি এতোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে যে সে ঘাড় ধরিয়ে যা খুশি তাই লিখিয়ে নেবে? শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তিমান, কারুকৃতি, কৌশল ও জমিয়ে দেওয়ার মতো মশলা থাকেই, যেটা তার বিচিত্র ও বর্ণচোরা রিডারশিপকে ঠেকিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। আমার আপত্তি ঠিক এখানেই। মনে হয় তাঁর 'বিয়োগান্ত অপচয়ের পাশাপাশি উদ্ধত প্রতিভার ঝলসানি কম। যদিও 'সোনার মাছি খুন করেছি'-র মতো কাব্যগ্রন্থ পড়ে মাথা নত হয়ে আসেনা এমন কোনো বাঙালী পাঠক নেই। তাঁর প্রথম জীবনের সফলতা নিশ্চয়ই অনেকের কাছেই মিথ, কিন্তু তাঁর এখনকার লেখা সম্পর্কে বুদ্ধিমান পাঠকের এত 'সৌজন্যস্নিগ্ধ উদাসীনতা' কেন? শক্তি নিজেও কি অনুমান করতে পারেন?

'ভিক্ষাই মনীষা'-র মতো ভালো কবিতা শক্তি একাধিক লিখেছেন। কিন্তু এত সৎসমর্পণের লেখা তাঁর খুব একটা নেই। ভিক্ষা—তা যেরকম ভিক্ষাই হোক্ কবিতার বিষয় হিসেবে একটু অতিরিক্ত স্নেহ আদায় করে নেয়। হতশ্রী, গরীব, নিঃস্ব কোনো ভিক্ষুককে আমরা দেখছি না, দেখছি একজন সংহত, প্রাজ্ঞ, তৃষিত ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে 'জীবন্ত ভিক্ষুক' এই বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। চাইছেন একমুঠি অন্ন, কিংবা রুটি কিংবা মৌন নীল জল। কিন্তু একমুঠি অন্ন বা রুটির প্রসঙ্গ অতিক্রম করে আমরা যখন শান্ত কুয়োতলার প্রসঙ্গে চলে আসি, একটুও অসুবিধা হয় না শক্তি মৌন নীল জল বলতে কি বোঝাতে চাইছেন। যোগাযোগ ছাড়া নদী—এই উপমা কি একটু ক্লিশে নয়? ক্লিশে কিন্তু এই সহজ মোটাফরাও এক অসাধারণ মাত্রা এনে দেয় যখন আরো সহজ করে আরোও ক্যাজুয়াল ভঙ্গিমায় কবি বলেন ভিখিরি তোমাকে একদিন ভালবাসতো আজ তার ভিক্ষাই মনীষা। এভাবেই হয়তো অতি প্রচলিত সহজ প্রাপ্য উপমা উত্তীর্ণ হয়ে যায় এক আলোক-প্রাপ্ত, প্রতিভাবান কাব্যবোধে।

যে-কোনো পথের বাঁকে ঈশ্বর আসেন। আমরা কেবল
দেরি করে যাই। আমরা কেবল
শুনি ইতঃস্তত ধ্বনি, বিকীর্ণ সজল
বকুল গন্ধের পাশে আহত দাঁড়াই

এক মুহূর্তের ত্রুটি। এক মুহূর্তের
ভিন্নতায় সমস্ত জীবন রিক্ত মলিন তমসা
কত যে সম্ভব ছিলো দিকে দিকে, শুধু আমাদের
মুহূর্ত বিলম্ব সব আড়াল করেছে।

এটুকু পড়লেই ধরা যায় আলোক সরকারের কবিতা। এতো শান্ত, এতো নম্র—যেন হাহাকার, ক্ষোভ, দুঃখ এসব প্রকাশ করবার মতো বাসনাশক্তি কবির নেই। পরিবর্তে রয়েছে এক জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা—যা জীবনের দিকে গোপনে, চোরাপথে উৎসারিত হয়ে চলেছে নিরন্তর। কোনো জাগরণের জন্য আপেক্ষা নেই কোথাও। হয়ত এক গভীর বর্ণের দীর্ঘ ক্লান্তিকর বিভাজন—ধীরে ধীরে একটা বর্ণ আর একটা বর্ণের ভিতর অন্তর্মিত হয়ে চলেছে—এতোটাই অলস হয়ত কবি। এতো আলস্য কি ভালো? একবারও কি বেশ জোরের সঙ্গে গলা খুলে কথা বলতে ইচ্ছা করে না আলোক সরকারের? আমি চিৎকার করতে বলছি না। কিন্তু তাই বলে এমন কি অন্যায় করেছেন যে সারাজীবন ঐ নামানো, বিধুর মুখে কথা বলে যেতে হবে? এই বর্জনযোগ্য অভিযোগগুলো একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলেই আলোক সরকারকে একটু কাছ থেকে লক্ষ্য করা যাবে। কখনো দিশেহারা নন, আবার যে খুব একটা ভারসাম্য আছে তাও নয়। ওঁর কম বয়সের লেখা পড়লেও দেখা যায় সেই একই চাপা স্বভাব। আর এই ধরণের কবিরাই কখনো কখনো হয়ে ওঠেন এক সংক্রামক নীরবতার মতো মরাত্মক। আগুনের উত্তাপও নেই, হৃদের প্রশান্তিও নেই—আছে

শুধু নাতিশীতোষ্ণ দিন ও রাত্রির সংগমকালের আলোকিত বনরাজি ও অতি-নিরীহ বাতাসের সঞ্চরণ।

কবিতাটির নাম 'আদিগন্ত'। নামটিতেই রয়েছে মনজগতের বাইরের আভাস। প্রথম স্তবকদুটি পড়লেই বোঝা যায় কবিতাটি কোনদিকে বাঁক নিতে চাইছে। 'ঈশ্বর' এই বহুঅর্থে ব্যবহৃত শব্দটি একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও, এর পরিণাম কিন্তু কোনো চাপানো বিশ্বাস নয়, কবিতাটি কোনোদিক থেকেই ধর্মীয় নয়। ঈশ্বর এখানে এমন এক ব্যক্তিত্ব যার দেখা পেলে জীবন আরো অনেক সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিত। যে-কোন পথের বাঁকে আমরা দেরি করে যাই আর ভাবি শুধু আমাদের মুহূর্ত বিলম্ব সব আড়াল করেছে। এমন একটা মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে এ কবিতায় যেটি প্রতিটি মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য, যখন দুটো পাখির কণ্ঠস্বর এক হয়ে অমূর্ত আকাশ এনে দিতে পারে ; জ্যোৎস্না এনে দিতে পারে দ্বিতীয় প্রকৃতি। খুবই শুভ্র, পবিত্র সম্ভাবনার কথা বলতে চেয়েছেন কবি—যার জন্য হন্যে হয়ে আমাদের এ-পথে ও-পথে বেলা শেষ হয়ে যায়। সমস্ত জীবন ধরে আমরা ভাবি কোন পথে সেই নিমেষ দেখা দেবে যার একদিকে চন্দন সুরভি আর অন্যদিকে লুণ্ঠিত বিষাদ, শাশ্বত কান্না আর আদিগন্ত মূক।

আলোক সরকারের কবিতা পড়লে কখনো মনে হয় না আমরা একটা খারাপ দেশে, খারাপ সময়ে বাস করছি। আবার এও মনে করবার কোনো কারণ নেই যে বেশ আছি, ভালো আছি। এ এক বিরল ক্ষমতা যে নিজের ক্লেদাক্ত সমকালিনতা থেকে কবি অন্তত তিন-পা দূরে থাকতে চান। তাঁর সময় Temporary নয়, Spatial. এখানে এসেই আলোক সরকারকে চিনে নেবার এক জরুরী জিজ্ঞাসা যেন আমাদের থাকে। এই ন্যূনতম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দাবি করতে পারেন কবি।

রাক্ষস

সেদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হ'ল।
তাকে বলি : এই তো তোমারই ঠিকানালেখা চিঠি, ডাকে দেব, তুমি
মনপড়া জানো নাকি ? এলে কোন্ ট্রেনে ?

আসলে ও নির্জনতা নয়। ফুটপাথে কেনা শান্ত নতুন চিরুণি।
দাঁতে এক স্তোকের দীর্ঘ কালো চুল লেগে আছে।

কবিতাটির নাম কেন 'রাক্ষস' রাখা হ'ল তার একটা সুদূর ইঙ্গিত কবিতাটিতে অবশ্য আছে। এই ছোট্ট কবিতাটি লোচনদাস কারিগর-এ সংকলিত। মাত্র ষোল পাতার বই লোচনদাস। সাম্প্রতিক উৎপলকুমার বসুর লেখা কোন দিকে বাঁক নিয়েছে তার একটা পরিষ্কার ধারণা এই পুস্তিকা থেকে মিলবে।

উৎপলকুমার বসুর লেখা চিরদিনই নাগরিক। নগর-জীবনের সমস্ত সাজসরঞ্জামের খবর তাঁর কবিতা থেকে পাওয়া যায়। ফরেন-গুডসের প্রতি তাঁর এক ধরণের লোভ আছে। সেটা বাংলা কবিতার পক্ষে কতটা জরুরী—সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

উৎপলকুমার বসু একজন শক্তিশালী কবি—এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ থাকার কথা নয়। 'পুরী সিরিজের' কবিতাগুলির জন্য তিনি আজো সমানভাবে শ্রদ্ধেয়। শ্রীযুক্ত বসুর লেখা আমি যতবারই মন দিয়ে পড়েছি—বারবারই একটি ছোট আক্ষেপে মন ভরে উঠেছে—ভালো লিখতে জানেন এমন একজন কবি কেন এতো স্মার্ট হতে চাইছেন। সে বয়স ও মন—দুটোই আজ আর থাকবার কথা নয় ওঁর। প্রকরণের দিকে যার এতো ঝোঁক, প্রতিটি বাক্যগঠনের দিকে যার জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা কি করে আরো নতুন করা যায় কবিতাকে, বহিরাবরণ ছাপিয়ে প্রায়ই যাঁর কবিতা উঠে যায় ভিন্ন মাত্রায়, তিনি কেন অযথা কবিতার গায়ে চাপিয়ে দেন চড়া দামে কেনা অতি আধুনিক পোশাক ! উৎপলকুমার বসু তার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে পরীক্ষাপ্রবণ তাতে সন্দেহ নেই এবং সেটা প্রাণের লক্ষণ সেটাও ঠিক, কিন্তু কখনো কখনো তাঁর একটু ভুল আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক পড়ে যায়। যেমন 'কাপি কাপি···'—এই কবিতাটি। বাঙালীআনাও তার ধাতে নেই পরিষ্কার বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও। যখন বলেন 'সুখের কথা বলো না আর', 'রাখো হাতপাখা' বা 'পরমার্থ সিঁড়ি' তখন আবার একটা কটু কৌতুকের আবহাওয়া দূষিত করে তোলে আমাদের মন। কিন্তু তিনি যে কত মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত, জোরালো, তার চিহ্ন তিনি বহু কবিতায় রেখে গেছেন। হৃদয়ের ফিসফাস হয়ত নেই, চোখের সূক্ষ্ম ইসারা বা আভাস তার কবিতায় বিরল। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করে দেয় তাঁর ঝরঝরে, তাজা, ব্যক্তিত্ব। তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মনের জটিল হায়ারোগ্লিফিক কখনো কখনো লাফ দিয়ে উঠে আসে আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়ের ভেতর। 'রাক্ষস' হল এমনই একটি কবিতা।

চুল নিয়ে দেশেতো বটেই, বিদেশেও বহু বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। তাতে কিছু যায় আসে না। চুল এবং তা যদি নারীর হয়, মুহূর্তেই পরিবেশ পাল্টে দেয়, এমনকি মেয়েদের মধ্যেও আনে এক চাপা অস্থিরতা। এখানে উনি লিখছেন সুরেন ব্যানার্জি রোড, নিশ্চয় এই রাস্তাটির নামোল্লেখের জন্য তাঁকে আমি নাগরিক বলছিনা। 'নাগরিক' এই শব্দটির মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত ধিক্কারও নেই আমার। 'গ্রাম্য' কথাটিতে যেমন একটা চাপা অবহেলা আছে—সেরকম কোনো দোষ 'নাগরিকে' নেই। এলিয়টের মতো কবিও ছিলেন নাগরিক। উৎপলকুমার বসুর লেখায় এমন একটা সফিস্টিকেশন আছে যেটা তাঁর বিষয়কে—তা হোক যুদ্ধ, কবর বা মেয়েদের সমুদ্রস্নান—অতিক্রম করে যেতে পারে না। হয়ত কারো কারোর এখান থেকেই শুরু হয় উৎপলবাবুর প্রতি যাবতীয় আগ্রহ ও উত্তেজনা।

'রাক্ষস'—নাটকীয়ভাবে শুরু এবং আরো নাটকীয়ভাবে শেষ এই অল্প পরিসরের কবিতাটি আমাদের চেতনায় এক ঝলক আলোর হল্‌কা জেলে মুহূর্তেই মিশে যায় অন্য কোনখানে। পাঠককে তিনি এতোটাই প্রস্তুত ভেবেছেন যে তাকে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় মর্মার্থের জন্য হন্যে হতে হয়। কবিতাটির নাম কেন 'রাক্ষস' রাখা হল তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবিতাটি তার পূর্ণ শরীর, রক্ত, হাড় মজ্জা সব নিয়ে উঠে এসেছিল আমার কাছে। রাক্ষসের কোনো চিহ্নই কোনো শব্দে নেই। কিন্তু অব-

চেতনার শ্রেষ্ঠ অংশের প্রতিকার যেন এই কবিতাটি। চিরুণিতে লেগে আছে এক-জন নারীর চুল আর চিরুণির দাঁত যা জ্বলজ্বল করছে কবিতাটিতে। মুহূর্তেই এটা অনুমান করা যায় শেষ লাইনে এসে যে কবিতাটি একটি নারী ও রাক্ষসের শেষ অসহায় অবশিষ্টটুকু ধরে গড়ে উঠেছে। কবিতাটি প্রথম অংশে ছিল বেশ ক্যাজুয়াল, রোমান্টিক, যেন বয়ঃসন্ধির তাড়না লুকিয়ে রয়েছে কোথায়। কিন্তু সেটা যে উৎপল বাবুর প্রতারণা সেটা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায় কবিতাটি শেষ হলে। সব ভার, সব গ্লানি, উৎকণ্ঠার অবসান এই পাঁচ লাইন ; কিন্তু এ সবের কেন্দ্রে রয়েছে একটি সামান্য চুল যা একজন নারীর কোনো গভীর ব্যথা, অপমানবোধ বা অন্যায় প্রতি-বাদের কথা একেবারেই নেই। খুবই তুচ্ছ নগণ্য একটি চুলের সম্মানে এতো মেলোড্রামা আমি বাংলা কবিতায় এর আগে দেখি নি। উৎপলকুমারের ক্ষমতা এতো আগ্রাসী যে প্রায় কিছু না বলেও কত অনায়াসে কবিতাকে পৌঁছে দিতে পারেন অলৌকিক পর্যায়ে—'রাক্ষস' তার প্রমাণ।

অলৌকিক বিব্যোন্মাদনা যদি বাংলা কবিতায় একজনকেও ছুঁয়ে থাকে, সেই, একজন বিনয় মজুমদার। তাঁর কবিতায় রয়ে গেছে এতোটাই স্বর্গের বিস্ময় এতো মুগ্ধতা, যেন একটি পলাশ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, যে কোন সময় তিনি বলে উঠতে পারেন 'এ গাছ পলাশ !' আর তখন, তখনই, নির্দিষ্ট হয়ে যায় একটি কবিতার জন্ম। বা, ধরুন 'রহস্য' কবিতায়. মাত্র তিনবার নার্কি রহস্যের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। এভাবেই তৈরী হলো কবিতাটির প্রথম লাইন। কথার মার প্যাঁচ, জটিলতা ও ছন্দবদ্ধতার থেকে বহুদূরে তিনি সৃষ্টি করে নেন তার আশ্চর্য সরল লজিক। ইডেনবাগানের প্রথম মানবীর মতো মুগ্ধবোধ তাঁর ব্যাকরণ। প্রথমবার বহুক্ষণ কেঁদে কেটে মুখ তোলার পরে, দ্বিতীয়বার পাশ্ববর্তী শয়নকক্ষে ও শেষবার রহস্য 'পায়ে হেঁটে ভূ-পর্যটনের জন্য যেদিন বেরিয়ে গেল'—এই তিনবার রহস্যের সঙ্গে তাঁর দেখা। এরপর যেন কোন অবচেতনের চোরাস্রোতকে তিনি সহজবোধ্য করে সাজিয়ে আনেন আমাদের সামনে, যেখানে ধ্বংস ও লিবিডো মিশে যায় রহস্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে।

'আত্মহত্যা ক'রে নেব ভেবে যেই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে প'ড়ে
ছুরি হাতে নিই
অমনি অস্পষ্টভাবে দেখা যায়—কল্পনায়—সেই ছুরি
রহস্যের তলপেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি
এবং কেবলি তার সেখানে ছুরিকাঘাত করেই চলেছি।'

'তলপেট' শব্দটির সর্বনাম হিসেবে 'সেখানে'র ব্যবহারের মধ্যে এক রম্য অশ্লীলতা রয়ে গেছে, বা বুদ্ধদেব বসু যাকে রোমান্টিক অন্যায় বলেছিলেন, হয়তো তাই।

'এই দৃশ্য দেখি ব'লে আত্মহত্যা বন্ধ থাকে,
কিছুক্ষণ পরে ফের ছুরি হাতে নিলে
ফের সেই দৃশ্য দেখি, বারম্বার এই হয়, তারপর ভাবি, দেখা যাক

রহস্যের পরিবর্তে প্রাপ্তির বা মাধুর্যের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছি
এই দৃশ্য দেখি কিনা দেখাও সম্ভব কিনা, কিন্তু বহু প্রচেষ্টা করেও
তা দেখা যায় না আমি সর্বদা—প্রত্যেকবার গভীর রহস্যকেই দেখি।'

ওই কবিতা তার সমস্ত উত্তাপ ও দিব্যোন্মাদনা নিয়ে ক্রমশঃ ভাস্বর হয়ে ওঠে যার পরিণতি শেষের অনবদ্য লাইন দুটি, যা সব যুক্তির শ্রেষ্ঠ যুক্তি, যা নতুন ব্যাকরণের শুরু, যা এই কবিতাটিকে তাঁর এক শ্রেষ্ঠ রচনার সম্মান এনে দেয়।

'একান্ত অবৈধ কাজ অবৈধ হলেও তা কি একবার করাও যেত না ?
কে আর উত্তর দেবে, ভূপর্যটনের জন্য রহস্য তো বেরিয়ে পড়েছে।'

অলোকরঞ্জনের 'নির্বাসন' এক স্মৃতিমেদুর কবিতা। এরকম কবিতা পরবর্তী সময়ে তিনি কম লিখেছেন। এই কবিতার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কোন বিশ্বমানুষ নন, শুধুই মানুষ, একক এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। ইটালিক্সে ঝুলে পড়া মাধবীলতারা এখানে নেই, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে হঠাৎ কোনো পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও নেই, নেই চতুর ছন্দ, চটুল আলাপ, চমকানো মিল। স্মৃতির শৈশবে সবুজ ট্রেনের মতো এক ব্যথাতুর নস্টালজিয়াই এই কবিতার আবহ, যেখানে 'নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে নাছোড় ভগবান।' যেখানে মায়ের প্রতি তাঁর বাঙালী মমতা, প্রিয়ার জন্য চিরকালীন টান, 'মুক্তক পাহাড় শ্রেণী', ঝর্ণার পরেই নদী, নদীর শিয়রে বাঁশের সাঁকোর অভিমান'

'আমি যতো গ্রাম দেখি
মনে হয়
মায়ের শৈশব।

আমি যতো গ্রামে যতো মুক্তক পাহাড়শ্রেণী দেখি
মনে হয়
প্রিয়ার শৈশব।

পাহাড়ের হৃদয়ে যতো নীলচে হলুদ ঝর্ণা দেখি
মনে হয়
দেশ গাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে-আসা প্রতিটি মানুষ।'

এইসব গ্রাম ও শৈশবের সঙ্গে, ঝর্ণা ও স্মৃতির সঙ্গে কি করে তিনি ভগবানকে মিলিয়ে ফেলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। নিশ্চয়ই শুধুমাত্র 'অভিমানে'র সঙ্গে মিলের কারণে আনেননি 'ভগবান'। নিশ্চয়ই আরও গভীরে রয়ে গেছে তাঁর মূল, যেখানে শৈশব ডালপালা মেলে বসে আছে নোয়াখালির শীর্ণ সেতুর পাশে। তবে কি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে হারানোর কথাও বলতে চেয়েছেন তিনি ? এখানে কবিতাটিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে একথা অনিবার্য। কবিতাটির নামকরণ অসাধারণ মনে হয়েছে আমার, যেহেতু এই নাম ছাড়া পড়লে যেন কবিতাটির অনেকটাই অপূর্ণ থাকে।

ক্রমশঃ আবিষ্কার করা যায় চারটি পংক্তির অন্তর্গত সহজ পরম্পরা। প্রথমে

তিনি দেখছেন গ্রাম, তারপর ক্রমশঃ সেই গ্রামের পাহাড় তার নজরে আসে। আরও মাইক্রোস্কোপিক হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টি, তিনি দেখেন পাহাড়ের হলুদ ঝর্ণা। এরপর স্থিরলক্ষ্য অর্জুনের মতো পাখির চোখের দিকে সংহত হয়ে আসে দৃষ্টি, যেখানে ঝর্ণাজলের নদী, নদীর শীর্ণ সেতু, নাছোড় ভগবান।

এই কবিতায় পাওয়া যায় অন্য এক 'অলোকরঞ্জনা' সোঁদা মাটির গন্ধ আর পলি। অথচ এরপর যতো তিনি এগিয়েছেন ততো বেছে নিয়েছেন নাগরিক চতুরালি, তাৎক্ষণিক বিষয় ছুটি ও ঠাট্টার আমেজ, লনে বসে থাকা রাধারমণ মিত্র বা আস্তৌনট শিশুকে। সন্ত্রস্ত ফ্রান্সের যে মৃত্যুযজ্ঞে গড়াগড়ি যেতো সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সেখানে বাংলার বধূর মাঙ্গলিক আলপনা এঁকে দেবার অদম্য নেশা তাঁকে কোন্ পরিণতিতে পৌঁছে দেবে জানিনা। হয়তো তিনিও জানেন না। একজন ক্রাফ্‌ট্‌-কুশল কবি হতে হতে একদিন তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসবে। সেদিন হয়ত বেশি দূরেও নেই। মিল ও ছন্দের প্রতি একজন কবির টান থাকা কোনো দোষের নয়, যদি তিনি তার স্বভাবের সঙ্গে জারিত করে নেন। অলোকরঞ্জন চিরদিনই এই স্বভাবের দাসত্ব করে গেলেন। ভালো কবিতা লেখার ভালো মিল দেওয়ার প্রতি ঝোঁক যাদের বেশী, অলোকরঞ্জন তাদের পক্ষে জলমগ্ন পাহাড়ের মতো প্রবঞ্চক, জাহাজ ডুববেই।

নিয়মিত পাঠকের কথা বাদ দিয়ে যদি কোনো সাহসী পাঠকের কথা আমি ভাবি যিনি বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দের পর বাংলা কবিতা এখনো লেখা হচ্ছে বিশ্বাস করেন না—তিনি এইসব লেখা পড়ে কি ভাববেন? তিনি কি ধাক্কা খেয়ে তাঁর বিশ্বাসে আরো গভীরভাবে নিমজ্জিত হবেন, না নতুন আগ্রহে জেগে উঠবেন, নতুন উদ্যোগে দোকানে দোকানে ঘুরে কিনে আনবেন কবিতার বই? এটা সমীক্ষার বিষয়।

তবে যেটা পরিষ্কার তাহল একটা সময় ছিল যখন একই সময়সীমার ভেতর এতো বিভিন্ন ও বিপরীত মেরুর কবিতা লেখা হত না। যে কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন কবি তার নিজের পথ খুঁজে নেন একদিন—তাতে কারোর পথ মহানগরে গিয়ে মেশে, কারোর পথ বেঁকে যায় ত্রিসীমানার বাইরে যেখানে ঈশ্বর অপেক্ষা করেন। আর বহিষ্কৃত, ভূতগ্রস্থ কবি দেখেন তাঁর বহুসম্ভাবনাময় ইলিসিয়াম।

কিন্তু যে ক'জন কবির কথা আমি এখানে বলেছি তাঁদের অনেকেই আজ পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, অনেকেরই বেরিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠ কবিতা, কাব্যসংগ্রহ। বাণিজ্যের সুবিধার কথা বাদ দিলেও, একটা সন্দেহ কি ঘনিয়ে তোলে না যে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের একটা সম্ভাব্য অবসানের পক্ষে রায় দিচ্ছেন। পঞ্চাশ বছর কি খুব একটা বেশি বয়স একজন অভিজ্ঞতা নির্ভর কবির পক্ষে। যদি তিনি বিশ্বাস করেন অলৌকিক শক্তিই তাঁকে কবিতা লিখিয়ে নেয়—সে কথা আলাদা। পঞ্চাশ বছর তো দেখতে শুনতেই লেগে যায়। যৌবনে হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল থেকে প্রৌঢ় বয়সে এসে নিজের প্রায় ফুরিয়ে আসা ক্ষমতাকে দার্শনিক প্রজ্ঞায় আশ্রিত না করে যদি তাঁরা পুনর্জন্মের জন্য ভিতরে ভিতরে হয়ে ওঠেন অস্থির সেটা হবে অনেক বেশী জরুরী।

অজ্ঞাতবাস

আলো সমীরণ রায়

তোমার অস্তিত্ব আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে খোলা ছাদের ওপর
তোমার পোষাক জ্যোৎস্নার মধ্যে উড়ছে হাওয়ায়
যদিও বহুকাল ধরে তুমি এসেছো এখানে
তবু এতোদিন ধরে তোমার শরীর ছিলো শুধু, তুমি ছিলে না
কিন্তু আজ তুমি রোদ্দুরের মধ্যে ক্রমশঃ বেঁচে উঠছো।
তোমার হৃদয় ক্রমশঃ বৃদ্ধের মতো প্রসারিত হয়ে উঠছে
এখন গভীরভাবে তুমি সব ভাবতে শিখেছো
এখন গভীরভাবে মানুষের 'আলো-অন্ধকার' রূপ তুমি বুঝতে শিখেছো
চাষীর কাস্তের সুর থেকে যে সৃষ্টির গান উঠে আসে,
তোমার মজবুত হাত আজ সেদিকেই ইতিবাচক চিহ্ন দিয়েছে
আকাশের ভাবাও ক্রমশঃ তোমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে আসে,
হাওয়ার মধ্যে যেন ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে
আর তুমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে ওঠো তখন, 'ফল আর সহজে নষ্টহবে না'
গাছ হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে তোমার সত্তা আজ রোদ্দুরে জেগে ওঠে

অগ্নিপুত্র

ভগ্ন-মৃত্তিকা-তরঙ্গ থেকে আজ ভেসে আসছে ক্রান্তি-সংগীত
অঙ্কুরোদ্গমের শব্দ শোনা যাচ্ছে বৃক্ষের গহনে
চুর্ণ ডালেও এসে বসছে পাখি, গেয়ে উঠছে বসন্ত-সংগীত।
কিন্তু তা সত্ত্বেও কেনো তুমি পাণ্ডুরতায় ফুঁপিয়ে উঠছো?
ওগো জঙ্গলবাসী, তোমার সবুজ হৃৎপিণ্ড কী তবে তক্ষকের দংশনে বড়
শীর্ণ হয়ে গ্যাছে?
তাই তুমি ভাঙা আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
ভরা ধানক্ষেতে শকুন-স্পর্শী কালো ছায়ার আগমনের শঙ্কায় শিউরে উঠছো?
দ্যাখো ওই দূরে সমুদ্র। বনের চিরহরিৎপ্রবণতায় লক্ষ্য করো ওই ব্যাপ্ত সমুদ্রকে।
শোনো, তোমার মধ্যেও তুষের প্রকৃতিতে জ্বলছে ওই কীর্ণ সমুদ্র-প্রতিভা
তুমি জন্মেছো অগ্নির সঙ্গমে, তাই অগ্নিপুত্র ওগো
শৃগালের চতুর ও হিংস্র পদক্ষেপে কেনো ন্যুব্জ হয়ে আসবে তোমার শরীর?

গান গেয়ে ওঠো এবার তুমি কাঠের জড়প্রকৃতির নক্ষত্র পর্যায়ে,
প্রণাম করো শাশ্বত সূর্যকে
বালির পোষাক ভেদ করে এসে দ্যাখো,
সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ আলোর নীল হ্রদের দিকে এগিয়ে চলেছে মসৃণগতিতে
আর জাহাজের পালে হাওয়া লাগার ঢেউ উঠছে আকাশে ॥

অসম্পৃক্ত

এলসালভাদোরের প্রতিবর্তক্রিয়ায় জলে ওঠে হীরা
পাথর ফাটে, বৃষ্টি পড়ে মৃদু কলতানে
ব্যবহারহীন জলে মরা মাছের চোখ যেন ওঠে জ্বলে
গাছের শিকড় বিদীর্ণ হয় বৃষ্টি পড়ার শব্দে
আর ঠিক তখনই গোলাপ-ঝুঁড়ি ছিঁড়ে যায়,
জোঁকের লালা বিলীন হয় স্বচ্ছ বরফে
বৃষ্টিবিন্দুগুলির অসংগঠিত সুরই শেষ পর্যন্ত ভেসে ওঠে চরাচরে
সাগর থেকে উঠে আসেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু,
পেরেকবিদ্ধ ন্যুব্জ শরীর
বুক চাপড়ে বিলাপ করে বলেন ঃ
আমি ব্যর্থ—ভাঙ্গা ক্যানেস্তারায় একসুরে গান গাইতে পারি না।

হ্রদ

সমকালীন হ্রদ অন্ধকার না আলোর আঁধার, আর ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তা সম্পৃক্ত হাওয়ার ব্যাপ্ত আবহে। আসলে সমকালীন সৌরবীজ বলে যা কথিত হয়, তা সত্যই কতখানি নক্ষত্রপ্রভা, তা বোঝা যায় ভবিষ্যৎ ঢেউয়ের তরঙ্গপ্রবাহে। বস্তুত সমুদ্র কখনো শুকিয়ে যায় না। শুধু মাঝেমধ্যে জল কমে গেলেও সমুদ্র চিরকালই সমুদ্র। এবং এইরকমভাবেই যদি সমগ্র চিত্রটি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে মহাকালের ঘোড়ার পদধ্বনি সন্নিকটেই শুনতে পাওয়া যায়। আর এইরকমভাবেই যদি বিচার করো মাছের খেলার প্রকৃতি আর তার কৃতিত্ব, তবে দৃশ্যটি খুবই স্বচ্ছ। জীবনের প্রতিরূপ কাঁচের দর্পণ, আর ওই দর্পণে অসখ্য আত্মা প্রতিচ্ছবিত হচ্ছে, আর তার সিদ্ধান্ত দু'রকম হ্রদে বিভাজিত হয়ে পড়ছে। ধ্রুব আলোককীর্ণ আত্মাগুলি এক সুবিশাল হ্রদে মাছরূপে রুপোলি আলোয় খেলে বেড়াচ্ছে, যে হ্রদ প্রতিটি শতাব্দীর অমলিন আলোর আঁধার। আর অন্য আত্মাগুলি, যারা সমকালীন সামগ্রিকতার 'আলো-অন্ধকারময়' গণ্ডীতে বাঁধা, তারা অন্য এক ফাঁপা হ্রদের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে আঁচরেই, কেননা তাদের পায়ের শব্দ শুধুমাত্র বর্তমানকালের ওপরই বিন্যস্ত। এবং উপসংহারে এবার বলা যায় যে, প্রকৃত আলোকের কোনো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই—মাথার ওপর নীল আকাশের মতোই তা চিরন্তন, অর্থাৎ শাশ্বত।

অজ্ঞাতবাস

ভালোবাসি অশোক দত্ত

মাঠের খানিকটা উপরে প্রধানতঃ দোলা খাই
উচ্চারণ করি ভালোবাসি ; কিন্তু কিভাবে
তোমাদের সকল বিষাদের দিকে নিজেকে নামাই,
ঝুঁকে মাথা ঠেকাই মাটিতে, চিবুক ধরে মুছে দিই জল ;

জল্লাদ রয়েছে ঠাঁই, হাতে তার মারণাস্ত্র,
তোমাদের দিয়েই শানানো, বাধ্য হয়েছো শেল ঘরে—
এ সমস্ত জেনেই আমি উড়িয়ে দিয়েছি পাখি
ওয়ার্শে, বিমান বন্দরে।

আজ এই দেশে মাঠের খানিকটা উপরে, বলো
আমি কার মাথা খাই ? বাতাসে সকল নারী-শিশু
জননীও রয়েছে আমার—ভাবতেও পারি না,
সমাজে আমার স্থান খুব কি মানায় ?

দ্বিতীয়তঃ যদি নিচে নামি, চিত্রপটে এসে
জমায়েত হবে সব চতুষ্পদেরা আর নিশাচরেরা
দাঁতালো শূয়োরেরা আর উজবুকেরা, আমি জানি
পিক্‌নিক্ প্রোগ্রাম হবে তিনরাত্রি জুড়ে ঃ

দিয়াগো গার্সিয়া থেকে নিয়ে আসা হবে হাঁড়ি-কুড়ি
মস্কো থেকে সীল মাছ আর ফ্লোরিডার উপকূল ঘে'সে
যে-পাখিরা রেকর্ড করেছে কিছু গান, সেইসব
এই সাথে উপদংশও এসে পড়বে তাহিটি দ্বীপের ;

চলবে প্রচার ঃ হ্যালো মাইক টেস্টিং, হ্যালো
ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর···জীরো, হ্যালো শব্দ গ্রাহকেরা
এখনো বাতাসে রয়েছে কিছু কবিতা, তোমাদেরই
নামাঙ্কিত মধুরতম মুখচ্ছবিগুলি, সংগ্রহ করো,

সংগ্রহ করো কিন্তু সংগ্রাম নয়—এমনই এক
গম্ভীর শব্দ-ধ্বনি, হাসি, আমাকে মাতাবে,
অথচ ভালোবাসি, ভেবে দেখো কী-এক
অসহ্য জ্বালায় পুড়ছে এই রক্ত-মাংস আজো।

ব্যর্থতা

মুগ্ধতাবশতঃ কিছু বই আমি হাতের কাছে রাখি।
কিছু তো হলো না, অথচ হঠাৎ জোনাকির রাতে কোনো ফুল
কোনো বুনো ফুল আমি যদি দেখে ফেলি, অথবা সে
তার বর্ণ-বিভূতিতে আমাকে খুব ঘনিষ্ঠ হতে বলে যদি
তবে নিশ্চিত বলে উঠবো 'অমৃতস্য পুত্রা', আমি মানুষ
আমার মাথার উপরে তোলা আছে সহস্র প্রেমের গান
আর ফুলেদের ফুটে ওঠার কালো কালো অক্ষরগুলি ;
কিছু তো হলো না তবু কিছু বই আমি হাতের কাছে রাখি
এবং যেহেতু মৃত্যুকে দ্রুতবেগে জাহাজ ঘাটার দিকে যেতে
আমি দেখি রোজ ঘুম থেকে উঠে, সেইহেতু মুগ্ধ থাকি,
বই হাতে কখনো বা নিচু স্বরে শিশুদের সাথে গপ্পো করি,
বলি ঃ ঘুমোবার আগে বুনো ফুলের কথা একটু ভেবো।

কাক

পূর্বতন তানপুরা বেজে উঠছে তোমার আকাশে ;
ইচ্ছে হয় ডানা গুটিয়ে বসি, যদিও পাশের ডাস্টবিন
আমাকে মুক্তি দিতে চায়না কিছুতেই : ঘাসে আজ
রাগ সকল বসেছে রঙিন জামা গায়, তবুও তো
আমি সেই কাক সঙ্গীতের অপর প্রান্তে, তোমার
আকাশ থেকে বহুদূরে বিশৃঙ্খলতায় একা, নগ্ন
নিম্নবিত্তের ঘরে চেয়ে থাকি চুপি ঃ তোমার আকাশ জুড়ে
কবে আমি হাঁস হবো, কবে আমার ঘুঙুর রইবে লাল পায়—
ভাবতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যেন খসে পড়বে সমস্ত পালক
যেন সেন্ট হেলেনায় আমাকেও ছুঁড়ে দেওয়া হবে মাঝরাতে।

মানুষ অপাবৃতা লাহিড়ী

যা শূন্যে অথচ শূন্যে নয় তাকেই সবচেয়ে ভালোবাসি। শূন্যে এই সূত্রে যে সে ঝুলে আছে, অব্যবহিত ওপরে ও নীচে কিছু নেই, যদি ভেঙে পড়ে, সরলরেখায় চকিতে নেমে আসবে মাটিতে,—অথচ স্থির— ; আবার শূন্যে নয় এই সূত্রে যে আলম্ব আছে, মাটি থেকে ওপরে উঠে তবেই সে ঝুলেছে সহজ প্রক্রিয়ায় ; অলৌকিক হয়েও অলৌকিক নয় কখনোই। তাই তাকেই আমরা ভালোবেসে উঠতে পারি যা এইভাবে একই সঙ্গে শূন্য এবং বস্তু, কারণ একমাত্র তাকেই আমরা ঘৃণা করতে সক্ষম হই ; যেহেতু বস্তু আমাদের সফল ব্যর্থতা এবং শূন্য আমাদের ধ্যান।

গোল

আসলে গোল আঁকাই বড়ো কথা, কীভাবে তুমি মিলিয়ে দেবে ধীরে ধীরে অথবা পারবেনা, সেটাই দেখবার। মিলিয়ে দিলেও মাঝখানে কোথায় কীভাবে ধর্মচ্যুত হ'লো, আর না মেলাতে পারলে কতখানি দূরত্ব রইলো দু'প্রান্তের, সেটাই তোমার ব্যক্তিত্ব। অবশ্য একটার বেশি গোল আঁকা উচিত নয় কারণ পরবর্তী গোলকে তুমি নিখুঁত ক'রতে চেয়ে, বহুরূপী হ'য়ে পড়বে অচিরেই, কিছুই না জেনে।
ভাগ্যিস এমন হয়না যে মোটে একটা গোল কেউ এঁকেছে, তাই বাতাস বইছে তাই খেলা ক'রে চলে বালকেরা।

পবিত্র দিনের হাওয়া রঞ্জন সরকার

আবার কাঠের শুদ্ধ ঘরে ঢুকি
মশা, গুণ গুণ রক্ত খায়, কাঠ খায়
মনে পড়ছে দিন ও রাত্রির মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে
আমরা এইভাবে ঘুরেছি কতদিন
মনে পড়ছে, শুধু মুখোসের মধ্যে মুখোসের খোলের মধ্যে
বকরাক্ষসের মত খিদে আর খিদের দৃশ্যের মধ্যে
আমরা মরেছি কতদিন।
আজ শেষ হল সব। কোথায় কে বাজাচ্ছে পুরোনো সরোদ ?
রাতের আপ ট্রেন ধরার সময় হল আজ

কি যে ইচ্ছে ছিল খুঁজে নিই
বন্ধুরা, জেনো তোমাদের চিঠি দেবো। আমার বান্ধবীরা—
ও আমার পবিত্র দিনের হাওয়া, ফিরে এসো
যারা স্নেহ দিয়েছিলে, সার বেঁধে দাঁড়াও সব। দেখ—
পাথরের মধ্যে ঐ জেগে উঠেছে রাত্রি ডালপালা মেলে
তার কুচো চাঁদ, ভালুকের মত দুখী।
বোকা গাছেরা কে গেল ? কে গেল ? বলে খুলে ধরছে সবুজ আগল

তাদের মধ্যে দিয়ে পথ কোরে, হে আমার প্রকৃত ঘোড়া
তোমার পিঠ কামড়ে এই তো ফিরেছি গাঁয়ে
বাঁক ফিরতেই, কাঠের স্তব্ধ ঘর, বারান্দা, রেলিং-এ তুমিও কাঁদছো
আর সমস্ত রাত তা শুষে নিয়ে
শুনিয়ে দিল প্রাচীন সরোদ
গ্রামময় বেজে চলেছে প্রাচীন সরোদ ॥

দোল মৃদুল দাশগুপ্ত

নেহাৎই কথার কথা, সামান্য নিজেকে ভেবে জানি ওকে, তবু
শোনো এতো অভিমানী যেন ওকে মানি
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বেঁচে ওর হয়ে
থাকি রং মেখে

জানিও ওকেই শুধু—তেমন শাসন আমি কখনো করিনা, শুধু
রাখে এতো স্থির কেবল মাটির ঢিবি, বোঝো
যে বন্ধুরা—যাও, বলো তাকে সে গাঁথে
যে ফুল মগ্ন—নিশ্চয়ই আমি
তার চূড়ান্ত ভিখারি

টের পাও, ও, ও, তুমি টের পাও···টের দেরি না করে বলো—
লিখে দাও—জানিও কে এমন উদাস করে ?
উড়ো চুল সংকটে না দুলে নিজেই
নিজের তাঁর এই
মুখ দেখি

কাঠের টেবিল, তার, ওদিকে যখন তুমি হঠাৎই কেন যে
চোখ ছলছল, নতমুখ, তারপর উঠে যাওয়া
ফের এসে খুশিতে দাঁড়ানো—শোনো—
আমি বুঝি এমনই জীবন পলাশের
অশোকের কৃষ্ণচূড়ার

দেবীমুখ

তাপ ও শীত একসঙ্গে আসে, হাসে সুসময়ে দুর্দিনেও
এ মাটির কোনো কোনো
বিশেষ অঞ্চলে।

তোমাকে শুষেছে ওরা ? ভরিয়েছে জলে ও বাতাসে ? তাই
কী বিস্ময়ে জাগো ! বলো না ওকথা
—জেনো এখনও তোমার কিছু
ডাকনাম নেই···

একবর্ণ দেখি শুধু। বদলেছে ? বিপন্ন হয়েছে নাকি সম্পদে ?
জানতে চাই না, আশা : সম্পূর্ণ হোক ওরা
দুই বোন, সম্পন্নও যেন হয়
গাঢ় এক রঙে।

পাশাপাশি দুটি টিলা—এ সত্য অস্থির নয়, শান্ত ঠিক
মাঝখানে পুণ্যকুম্ভের সেই কলস
বসানো—মুখ আজও ঢাকা

খরা তাপস ভট্টাচার্য

অনিশ্চয়তার দিকে বেঁকে গেছে পথ
ফসলের সফল শিহরণের পরিবর্তে
প্রকাশিত মাটির কঙ্কাল

ঢেঁকি থেকে অনেকদূরে কিষাণ বধূর পা
ফিকে হ'য়ে গেছে সবুজ শাড়ীর রঙ
পায়ের পাতায় অন্বেষণের শিরা

অলৌকিক তাপস রায়।

ঘোড়া ও ঘোড়াদের প্রেত লাফিয়ে উঠে পরে
হয়ে গেল কবরখানার বাগান, ওখানে
ঘোড়াদের সঙ্গে মানুষেরাও ছিল ঘুমিয়ে
তবু ঘাসেদের যৌনপীড়নে শুধু ঘোড়ারা
আগে উঠে যেতে মানুষের কবর এবার
দ্রুত জেগে উঠলো, দূরে জেগে উঠলো চাঁদ

মন্ত্র

অনন্ত পাখির মতো ওড়াবে না কেউ
জেনে খাঁচা ও মৃত্যু বিষয়ে দু-একটি
মন্ত্র শিখে যাই জীবনের দাঁড়ে বসে
নিজেকে শোনাই তা ভুল ছন্দে, পয়ারে

পরিচয় গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার চোখে চোখ মিলিয়ে
কাল তাঁকে দেখেছি,
পৃথিবীর এক বিধ্বস্ত কবি।

কবিতা আর কাব্যের প্রলোভনে,
সময় দুর্বার—
জানা চেনা সবকিছু ফাঁকি,
সবকিছু ফিকে ফিকে ছবি ॥

কবি,—
জন্মান্তিকে বলি,
বিধ্বস্ত নই—
আমি ধরণীর নিরাসক্ত কবি।

সব মন্ত্র মন্ত্র নয়

জয় গোস্বামীর কয়েক টুকরো গদ্য-কাঠামোর কবিতা পড়লাম। জয় যাই লিখুক না কেন, তার উত্তরণ ঘটে যায়। নিজস্ব আবহ জয়ের তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু গদ্য কাঠামোতে জয়কে কোথাও কোথাও আমি বেশ আড়ষ্ট হতে দেখেছি। জয়ের হাতে তৎসম ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার খোলে ভালো। অবশ্যই তা ছন্দ-কাঠামোর মধ্যে। গদ্যে অত্যধিক তৎসম শব্দ মানায় না বলে আমার মনে হয়। তদ্ভব ও দেশজ শব্দই গদ্যে খোলে ভালো। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের গদ্যে/পদ্যে এমনিতেই ব্যবহারিক / নৈমিত্তিক শব্দ যখন সুন্দরভাবে স্থান করে নিয়েছে, তখন, গদ্য কাঠামোতে অত তৎসম শব্দের ব্যবহার ভালো লাগবে কি করে! কিন্তু উপায় নেই। জয়ের যে নিজস্ব কাব্যভাবনার জগৎ—সেখানে ভারি শব্দ, তৎসম শব্দ জরুরী হয়ে পড়ে। এবং ফলত সে গদ্যও হয়ে পড়ে একটু ভারি। গদ্য-ভাবনার মধ্যে বিরাম-এর জায়গারও অভাব দেখেছি ওর মধ্যে। জয়কে বোধ হয় ছন্দের মধ্যেই মানাবে ভালো। তাছাড়া অনেক সময় জয়ের গদ্য-কাঠামোর কবিতাগুলি ছন্দে লেখা কবিতার টানা কম্পোজ বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে জয়ের সচেতন হওয়া উচিত। সুবোধ ও মল্লিকার কবিতায় চাপা পয়ার আছে, যা প্রায় গদ্যের মতো পড়া যায়। ভালোই লাগে। এ ব্যাপারে মল্লিকা বেশ সফল। চমৎকার ওর শব্দের ব্যবহার। কিন্তু সুবোধ আমাকে বেশ ক্লান্ত করে মধ্যে মধ্যে। কেননা, সুবোধকে ছন্দের মধ্যে বেশ আড়ষ্টই মনে হয় আমার। অনেক সময় ও জোর করে টানছে বলে মনে হয়। সুবোধ গদ্যে হয়ত ভালো করবে। কিন্তু, সুবোধও অতিরিক্ত তৎসম শব্দ ব্যবহার করে। এটা আমার পছন্দ হয় না। বাংলা কবিতার ভাষাকে তৎসম শব্দের আধিক্য মুক্ত করে মৌখিক শব্দের স্থান আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলেই যেন ভালো হয়। এতে কবিতার ভাষার উন্নতি হবে। এটা বৈজ্ঞানিকও বটে, আধুনিকতা-ও বটে এবং ইতিহাসেরও নিয়ম বলে আমার মনে হয়। যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথ / জীবনানন্দও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ ব্যবহার করতেন। আমরা কি তা আর করি? (পার্থপ্রতিম এরকম করছেন, এবং তাঁর দেখাদেখি কেউ কেউ, কিন্তু সেটা সাধারণ ট্রেণ্ড নয়)। রবীন্দ্রনাথ তো 'তরী', 'নায়', 'শশী' এরকম সামন্তযুগীয় শব্দ বহু ব্যবহার করেছেন, আমরা কি তা করি? ইতিহাসের নিয়মে আমরা তা আর করি না। —হ্যাঁ, সুধীন দত্ত ও বিষ্ণু দে তৎসম শব্দ ব্যবহার করতেন। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন খোলা মেলা। সে যাই হোক, ব্যক্তিগতভাবে তৎসম শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার আমার পছন্দ হয়না এখন, কবিতায়। যেমন সুবোধের একটি কবিতার নাম 'ঋক্ষ মেষ কথা'। 'ঋক্ষ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। মানে ভালুক। এখন বুঝুন, ঐ শব্দটির জন্যে কি আমাদের অভিধান খুলতে হবে? আমি একটু বিরক্ত হই। আমি, মানে যে অতি সাধারণ একজন পাঠক। তবু বলব, 'ঋক্ষ' শব্দটিতে আছে এক সুদূঢ় রহস্য। হয়ত, সুবোধের মতে ঐটাই কবিতা! আমাদের বড় বাবুর কাছে শোনা

একটা ছোট্ট গল্প বলি এখানে। বড় বাবুর বাড়ী খড়ে নদীর ওপর। এক ব্যক্তি রোজ সকালে তার বাড়ির পাশের পথ দিয়ে স্নান সেরে বাড়ি যায়। যাওয়ার সময় সে একটি স্তব করতে করতে যায়। স্তবটি খুব সংক্ষিপ্ত। বিড় বিড় করে অতি পবিত্র মনে সে বলে 'শ্রী গুরু নিতম্ব'। সারা পথ সে শ্রী গুরু নিতম্ব স্তব করতে করতে বাড়ি ফেরে। একদিন বড়বাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও মশাই, আপনি কি মন্ত্র বলছেন? সে উত্তর দিল—কেন, শ্রী গুরু নিতম্ব! বড়বাবু বললেন, ও মন্ত্র আর বলবেন না, ওতে আপনার পাপ বাড়বে ছাড়া কমবে না। এ বয়সে ও মন্ত্র বলতে নেই। লোকটি বড়বাবুর কথায় হা হা করে উঠতেই বড়বাবু মন্ত্রটির মানে পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন—শ্রী মানে সুন্দর গুরু মানে এখানে ভারি বা মোটা নিতম্ব মানে পাছা। সাধারণত মেয়েদের রূপ বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। এটা যদি আপনি মন্ত্রের মতো পড়েন এই বয়সে, তা হলে তো আপনাকে লোকে লম্পট বলবে। —তো, ঐ লোকটা 'নিতম্ব' শব্দটির মানে জানতো না বলে এই বিভ্রাট। সাধারণ পাঠক ইক্ষু পর্যন্ত হয়ত বুঝতে পারে, কিন্তু ঋক্ষ বুঝতে গেলে তার ও রকম শব্দ বিভ্রাট হতেই পারে। তাছাড়া কি এমন দরকার আছে, জটিল সব তৎসম শব্দ এ যুগে বসে ব্যবহার করার? সুবিধে একটা অবশ্যই আছে। খুব সহজে একটা ভারি গোছের ব্যাপার তৈরী করে দেওয়া যায়। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের এটা বৈশিষ্ট্যই কিন্তু বাঙালী পাঠকের একটু অসুবিধে হয়না? সুবোধও হয়ত, বড় কবির মেজাজের সঙ্গে তুলনীয়।—পাঠকের কথা সুবোধকে ভাবতে হয়না। কিন্তু মল্লিকা? যতদূর মনে হয়, মল্লিকা পাঠকের কাছে যেতে চায়। শব্দ প্রয়োগে চমৎকারিত্বও আছে, তবু অতো তৎসম শব্দ কেন? অতো অতিরিক্ত চালাক-চতুর বাক বিন্যাসের দিকে ঝোঁক কেন ওর? আর যে মৃদুল ছিল বেপরোয়া, স্টান, তার এখন এক কৃত্রিম ফর্মের দিকে ঝুঁকবার জন্যে মন ছুঁক-ছুঁক করছে কেন? অজ্ঞাতবাসে পাঠানো চারটে কবিতা আমি দেখেছি (অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ আমার আছে বলেই) ওর। আগে তো ভূমিকাতে 'পৃথিবীর দীর্ঘ পয়ার' লিখেছিল মৃদুল। এসব যে ভালো নয়, তা কি করে আমি মৃদুলকে বোঝাবো? (বোঝানোর দায় অবশ্য বিন্দুমাত্র নেই আমার)। তবু খারাপ লাগে, খুব খারাপ লাগে—এরকম সহজ-ট্র্যাপে পড়ে যেতে দেখলে, মৃদুলের মতো কবিকে। মেজাজ ঠিক রেখে মৃদুল তার সেই চর্বিহীন ভূমিকায় ফিরে গিয়ে যা হয় লিখুক না, দেখবেন ও ভারি ভালো কবিতা লিখতে পারবে। এই ট্র্যাপের মধ্যেও মৃদুল যখন লেখে 'তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়'—তখন ওর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ থাকে না।

এই চারজন কবি আমাকে সবচেয়ে চিন্তার মধ্যে ফেলেছে সম্প্রতি। কেননা এদের কবিতার মধ্যে আমি অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব সব সময়ই আশা করি। এরা শক্তিমান কবি। ভেসে যাওয়া এদের ধর্ম নয়। তবু এই সমস্যা। আমি চাই ছন্দ, তান, শব্দ, শরীর কবিতার ওপর ভেসে না থেকে কবিতার ভিতরে চলে যাক, কবিতাই ওপরে উঠে আসুক তার নির্ভর আত্মা নিয়ে।

দেবদাস আচার্য

ভারতবর্ষ স্নেহাশিস শুকুল

অদ্ভুত হলুদ চাঁদ এক দেখা দেয় রোজ রাতে, একথা বলে
ও পাড়ার সনাতন চোখ নামায়
এবং এক অস্বস্তি খেলা করে সমবেত শ্রোতাদের ভেতর
শুধু সনাতন দেখেছে সে চাঁদ, সনাতন
একথা মুখে মুখে ফেরে আর সনাতন এক অদ্ভুত চাঁদের
গল্পের নায়ক ঝিম মেরে বসে থাকে
তার গা থেকে গলে পড়ে ঘাম আর চুল বেয়ে
নেমে আসে উকুন
এবং সে খেরাল করে অপ্রাকৃত রহস্যে কেমন তার নাম
উড়ছে বাতাসে
সে সবার অলক্ষ্যে বড়ো মমতায় জিভ, দাঁত ও তালুর সাহায্যে
নিজেকেই ডাকে সনাতন

আর তখনি তার মেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে
বাপা, তোরেই গলার আদলে নিশি ডাকে
তুই সাড়া দিসনে॥

আজন্ম

শুধু মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যই যেন এত ভালবাসাবাসি
এতো গান, এতো বাসি ফুল
শুধু ভুল শব্দে বলে যাওয়া, ভাল আছি
ভাল আছি
শুধু মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যই যেন জাগতিক সব কিছু
যেন ঋতু বলেছিলো বলেই পৌঁছে যাওয়া ঋতুর দরোজায়
অথবা এসব কিছুই নয়
ঋতু নামে মেয়েটির লোভ নয়, বরাভয়
ক্রমশঃ বয়স্ক করে

স্বাদ আনে স্বাদিষ্ট আহারে
তবু হাত থেকে পড়ে যায় কখনো গরম ভাত এবং
সরে যায় আঙুল থেকে ভাতের উষ্ণতা
আর তখনি মনে হয়,
শুধু মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যই যেন এত খিদে
এতো প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ
এতো ভয় ॥

অরাজনৈতিক

তাকে ডেকে আনে সে এবং তার দুহাতে তুলে দেয়
একটুকরো জমি আর ভাবতে শেখায়
ঠিক মতো খুঁড়তে জানলে ঠিক জলের স্পর্শ তার দুহাতে
রেখে যাবে জলের দাক্ষিণ্য ও অভ্যাস

সে মাটির উপর উবু হয়ে বসে

তার পায়ের উপর দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন হাঁটা চলা করে
পিঁপড়ে ও কেন্নো আর পায়ের তলায় মৃত উদ্ভিদ শুয়ে থাকে
তার চোখের সামনে একটুকরো জমি ও মৃত্তিকার অনেক
গভীরে জল দৃশ্যমান হয় শুধু
সে দেখে কেমন জলের কাছাকাছি নরম মৃত্তিকার খোঁজে
মাটির দেওয়াল সাঁতরে নামছে মুগ্ধ শিকড়
সে বাঁরে পা থেকে ছাড়ায় জোঁক
ও রক্তে মাটি ঘষে দেয়
আর পূর্বপুরুষের ঘাম ও দীর্ঘশ্বাসে উর্বর জমির উপর
হাত রেখে বলে, আহারে ॥

মৃত্যু

একদিন বিশ্রান্ত তিনি, সংকটমোচনে যখন ভ্রষ্ট, পরাভূ
তখনো পরিত্যাজ্য নয় তাঁর গার্হস্থ্য কৌতূহল
তাঁকে ঘিরে থাকে উদ্ভিদ ও পাথর
আর চঞ্চল স্বজনেরা

তিনি উদ্ভিদের জন্য লুণ্ঠন করে আনেন দিব্যজ্যোতি আর
প্রবহমান জল এবং অনিন্দ্য বর্ণে চিত্রিত করেন পাতা
তাঁকে ঘিরে পাথর ক্রমশঃই ভারী হয়ে ওঠে
আর তাঁর কপালে দেখা দেয় স্বেদকণা
শ্লথ হয়ে আসে দৃষ্টি ও ঔৎসুক্য
আসন্ন সন্ধ্যায় মানুষের পূজ্য শস্য ও মৃত্তিকার কাছে
তিনি ক্ষমা চান,
এবং স্বজনেরা তাঁর চোখের উপর নামিয়ে রাখে
অনিবার্য তুলসী সেই তখনি ॥

ভুল শব্দ নিয়ে

এতো ভুল শব্দ নিয়ে কি করবি বালক
তার চেয়ে চল নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে শব্দের প্রতিমা
ফিরে আসি, দায়দায়িত্ব থাক
মন্মথ কুমোরের গড়া যোনিহীন প্রতিমার তবু থাকে রং ঘামতেল
প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হয় নাকি
তবু দেখ শেষমেশ জলেই আশ্রয়
দেখে শেখ
কথা রাখ
এতো অকৃতজ্ঞ শব্দের সাথে বসবাস মেলামেশা ভালো নয়
টুসুগান গেয়েছিল যে মেয়েটি
মেলাশেষে সে যে কাল ফিরে গেছে
তা কি তুই জানিস
শব্দের আশ্রয় পেতে সেও তো চেয়েছিল
কথা রাখ বালক
ছুটে যা
নদী দেবে তৃষ্ণায় জল, গাছ দেবে ছায়া, আর সে দেবে
যা কোনো বালিকাই দিতে পারে শুধু
এমনি কান্না
ভুল শব্দের সাথে বোঝাবুঝি সেরে নে বালক
আয় হাত ধর, আমি মধ্যস্থতায় রাজি
এখানে নদী ততো গভীর নয় ॥

সকাল সঞ্জীব প্রামাণিক

ঘুমের জড়তা নিয়ে জেগে ওঠে বাড়ী—
খবরের কাগজ আসে ঘরে ;
দুধ দিয়ে যায় দুধঅলা।

দু'একটি মানুষ শুধু ছড়ি হাতে দেবতার মতো
হাওয়া খেতে, শুধু হাওয়া খেতে পথ হাঁটে ;
টুথব্রাশ হাতে নিয়ে টের পাই সকাল হয়েছে।

গল্প

ঘুমিয়ে রয়েছি যেন। আর তুমি ডেকে তুলে বলো—
'আজ ভোরে গোলাপ ফুটবে টবে। আর সকাল হবার আগে
ঢাক বাজানোর মতো ডেকে উঠবে মেঘ'। মাঞ্জা দিয়ে যে লাটাই
রেখেছি অনেক আগে আমি আজ কোথায় পাঠাবো !

না হয় তুলেছ ডেকে ? ভুল ক'রে বলবে না—
তুমিও পাগল, বৃষ্টির ভেতর ঘুড়ি উড়তে পারে না।
এখন অনেক রাত, আবার ঘুমাও
আরব্যরজনীর মতো তোমাকে নিছক এক গল্প শোনালাম।

শিকার

ঝলসে উঠছে আজ থেকে থেকে অন্ধকারে হীরের চাকুটি।
জোরসে চালাও রথ, যাতে পৌঁছে যেতে পারি বন ছেড়ে দুত ;
হরিণ শিকারে এসে অমঙ্গল দেখা দিল ; তোমরাও ভাবো
বিবাহের দিন যদি রক্ত ঝরে মঙ্গল হবে না ; আমি সহ্য
করে করে এতদিন পর সন্ধি মেনে নেব বলে এসে শুনি—
আমার মতই একজন আমাকে খুঁজছে ; তারো দেহে লোহা
লবণ ও অম্ল আছে ওং পেতে ; সে কেন আমাকে ছাড়বে ?

আমাকে জড়িয়ে ধরে লোকজন বনের ভেতরে করে ছোটাছুটি।
এমন বিপদ তবু হতে পারে ! ও যে আমার সাথেই শুতো
এক বিছানায় মনে নেই ? পার্কে ঘুরতো, তাছাড়া ভাব ও
তো ছ বছরের ; তবে কেন একজন আজ আবার আমাকে খুঁজেছে ?
'আমিও তোমার মতো এখানে এসেছি'—তবে তাকে এক্ষুণি
বলে দেব সব কথা, যা ঘটেছে ; দোষ না-আমার তোমার-না ;
একটি শিকার নিয়ে দুজন লড়েছি, সে কি আমাকে মারবে ?

সঘন মসৃণ পাতাগুলি শংকর চক্রবর্তী

পাতাগুলি ঝ'রে যাচ্ছে অবেলায়, অথচ পাতার
যে-সংসার এতোদিন মাত্র দু'টো বিড়ালের লুকোচুরি খেলা
দেখেছিলো, সাদা বা কালোয়
তারা অহঙ্কারী গ্রীবা তুলে দ্যাখে, ঘনিষ্ঠতা খুব
কাছাকাছি নয়, কিন্তু তা গাছ বা হৃদয়ের মাটি
ছুঁয়ে যায়—যদি বর্ষা কখনো নিশ্চিত
জল ও মেঘের জিভ মুচড়ে স্বপ্ন আনে নেচে নেচে
বিপর্যস্ত মিছিলের মতো, পাতাগুলি একা, ভূমির অজ্ঞতা
তারা বুঝে যায়, চিহ্ন যা থাকে শিকড়ে, সবই দর্শনের ছোঁয়া
রঙের বর্ণনা মাত্র ; আসলে বিড়াল দু'টি মেরুদণ্ড কাঁপায় তখনো
মাতাল সংলাপে বলে, 'ওই অবতরণ
পাতা বা ফুলের নয়, মাংস কুড়ানোর মতো নিচু-হওয়া এক
উৎপাটিত জমি শুধু সঘন মসৃণ পাতাগুলি।

স্নায়বিক জীবতোষ দাস

সেই সব স্নায়বিক ভারসাম্য যখন হারিয়ে যাবে
তখন হি হি করে হাসবো পথের দিকে চেয়ে
তারপর একদিন হয়ে যাবো রাস্তার ষাঁড়
সবকিছু ঘোলাটে মনে হয়
আমার জন্য কেউ রেখে দেয়নি কোনো উপহার
হাসপাতালের আউটডোরে ঢুকেও
আমি আবার ফিরে আসি আপন মনে
শুধু ভিড় নেই বেশ্যাপল্লীতে

অসুখ অংকুর সাহা

অপাঙ্গে চেয়োনা তুমি, নিবিড়তা জেগেছে স্নায়ুতে
ঘুমোও, ঘুমিয়ে থাকো অমনস্ক সোনালি অসুখে
হলুদ খড়ের মতো ম্লান মুখ, নীল শিরা সাজানো দুহাতে
হেমন্তের সূর্যালোক যেরকম ভেঙে পড়ে নির্জন মেঘের
সাজানো সীমান্ত ভেঙে ; পাখিরাও চঞ্চু নয়, স্থির চক্ষু দিয়ে
অসুস্থতা শুষে নেয় আশ্চর্য পদ্ধতি অনুসারে।

মাটির প্রত্যন্ত থেকে ঘরে ফিরে আসে দুঃখীজন
প্রকৃতি-আঘাতে দীর্ণ—ভরপুর সুখে বেদনায়
ক্ষতগুলি ঢেকে দেয় অপার মমতা দিয়ে শস্যল হলুদে
কোমল প্রলেপ তার ছুঁয়ে থাকে রাত্রির নিঃশ্বাস ;
এবং ঋতুর ডাকে নতুন ঋতুরা আসে, শসোর সময়
গ্রামে গ্রামে এলোচুল উপাসনা করে যুবতীরা।

অসুখে অসুখে ক্রমে স্মৃতি ক্ষীণতর হয়, ধূসরতা বাড়ে
চোখের পরিধিময় রক্তাল্পতা মাথা চাড়া দেয়
শুশ্রূষার ডাক ছাড়ে দিগন্তের ক্রীমসন রোদ্দুর ;
সন্ধ্যার বাতাস জুড়ে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি রব
অমোঘ শক্তিকে ডাকে পুরানো আঙ্গিকে—সেই ডাকে
দেবতারা নেমে আসে আত্মঘোষ মুখর প্রাঙ্গণে ॥

লবঙ্গ-কপাট মবিনুল হক

লবঙ্গ-কপাট যেন দীর্ঘদিন খোলা—তাই উজবুক, তোমার ও-ত্বক
বেয়ে আরশোলা-সমান স্থৈর্যে, ব্যগ্রতায় সতর্ক তস্কর চোখ
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অকস্মাৎ বুদ্ধমূর্তির পিছে বিস্মৃত ভূ-লোক
হঠাৎ চঞ্চলমতি ; শিহরণে ইউরেকা, উদ্ধার, জয়—অদূরে বালক
তৈরি, গোষ্ঠ ও নির্ণায়মান বাঁশি হ'তে বস্তুর নিভৃতি খুঁড়ে
টুকরো সড়ক এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে ঐ জানালার পাশে। পাশেই কর্ণীমুখ
সুডৌল যুবতী চিরুণী চালাতে গিয়ে চুলে, কেন যে উন্মুখ

কালো কালো রিপ খুলে প্রদীপের নীচে, যেখানে শরীর পুড়ে
ছাই হ'য়ে কিম্ভূত আকাশমুখো সর্বনাশী হ'য়ে খেলা করে
আর পাহাড়তলীর গাঁয়ে দুন্দুভি এসে, এসে শিশ্ন-সফল আত্মীয়েরা
লুটেপুটে, মোমের গভীরে নেমে স্নাত হয়—যেন ঘুঘু যেন শালিখেরা···
তবু, লবঙ্গ-কপাট যেন দীর্ঘদিন খোলা বুদ্ধমূর্তির পিছে উদ্ভিন্ন কেশরে

যদি মনের ভিতরে

যদি মনের ভিতরে ধরা দিস
তবে তোর কথা মনে রেখে
পরিক্রমা ক'রে যাব দূরত্বের দুই মেরু, অবিরল

ঘুম থেকে উঠে চরিত্র-হনন দেখি বাজে
যৌনতা নামক মৃদু পাপড়ির ভিতরে বসে, একা ;
কতোদিন বন্দী থাকার পর অহিফেন ঝিম ছিঁড়ে
মনের ভিতরে তুই ? তুই
যদি রেগে টং হোস, বোবা হোস, ফুটিস গোপনে
আমার কান্না পাবে নগরে-বাজারে

ক্রন্দন ঢাকার জন্য রাখিস রুমাল
পরিক্রমা শেষে তাই-ই
পুঁতে দেবো পতাকার মতো।

বারণ ছিল সমরেন্দ্র মণ্ডল

বারণ ছিল কথা বলা
বারণ ছিল জানা
বারণ ছিল ছেলেবেলায়
কস্তুরী ভাঙবো না।

এক নিমেষে হালকা হাওয়ায়
ভাসিয়ে দিল সব
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
জল নড়ে সপ সপ।

বারণ ছিল একলা যাওয়া
বৈঁচি কাঁটার বনে
বারণ ছিল মিস্টি দোলায়
বারণ ছিল মনে।

একলা কখন হারিয়ে গেছি
খুঁজেও পাবেনা।

তিনটি কবিতা

ছায়া উৎপল দে

কেঁপে কেঁপে মিশে গেছি আজ, ফণী মনসার ঝোপে—যে ৩০ লক্ষ ফোটনের কণা
ঝাঁপ দ্যায় থাবার মতোন···শুধুই দেহের শোষণ ছাড়া দ্রুত কোনো ক্ষয়
জানা ছিলো না তখনো। বসি মাথামাখি পড়ে আছি তন্ত্র সাধনে
বুনে দিয়ে গ্যাছো যাকে, কম্পনে দুলে উঠে এমন মুহূর্তেও শেষ হয়ে যাবে সে
আমারই গ্রাসেতে! বাকী সব সঙ্গীরা পালিয়ে গিয়েছে···যদি এই হয় তবে
আর ফিরবো না; ক্ষয়ে ওঠা হাড়কাঠে পেতে দেবো শরীরের ছোঁয়া—
যা কিনা ইথার!
শ্মশানচারিণী, তুই বুঝি কুৎসিত আঙুলে আঁকড়ে ধরেছিস আমায়?
কারো স্নেহ পাবো না জেনেই
তা আমার কলঙ্ক নয় রক্তের ফুল—ঘিরে আছে এক অন্ধ, পল্লীগণিকা

মরুভূমি

দূরে দ্যাখা দিলে হিলিয়াম স্তর আবার তো সব ছেড়ে দিতে হবে—স্যাঁতসেতে ক্যাম্প
দড়ির বিছানা; কেউ মনে রেখে দ্যায়! অথবা স্বপ্নের জিপসী মেয়েরা
পাক খেয়ে খেয়ে সরে গ্যাছে···সমস্ত ডায়াসে তখন জাদুর উল্লাসে
ভুলে আছি তাঁবুর নিশানা। খালি, এই ক্যাম্প খাটে গরম নিশ্বাসে ঘুরে ঘুরে গ্যাছে
প্রেতের চেহারা···মনে হয় আমিই ফিরবো না কখনো আর

অজ্ঞাতবাস

এখনো আকারহীন, হয়তো বা শব, অথবা গ্যাসীয় পিণ্ডে মাখামাখি—অহেতুক!
তাও কতো দিন? কতোটুকু আয়ু বাকী আছে এরপর
নিঃশেষে পুড়িয়ে দেবার; নীল বাড়িটির সামনে সামনে!
সাইকেল বেল শোনা যেতে
গরাদের গায়ে দ্যাখা যেতো টানা ফাঁস···ফুলে ঢাকা কি কফিন
তুমি রাতে পচা লেক থেকে তুলে এনে দেখেছিলে—স্ফটিকের চোখ! সে অবধি
ঘুম আসছেনা। ভেতরে ভেতরে, ভাবো—অন্য অংশেরা বদলে গিয়েছে জেনে
অই মর্গের কাছে নিজেও আসতে চাই নি। তখনো বাষ্পের কণায় কণায় আমি নেই
যেটুকু ছায়া তৈরী কোরেছি তিলে তিলে, তুমি যদি মুছে দিতে চাও সেটুকুও
কষ্ট হবেনা একেবারে। টেনে নেবো তার ছোটো হয়ে আসা ছেঁড়াজামা,
চন্দন ছোপ্ লাগা
শিয়রের ফুল—কেঁদে উঠে! তা হলে কিছুই বোঝো নি
কেন ওকে দাওয়ায় শুইয়ে চলে আসতাম; তোকে রেখে পাহারায়
গলার তাবিজে সব লিখে রেখে গেছি, জানতে পারবে একদিন
আজ কিছু বলবো না···আজ আমি ফেটে, শুকিয়ে উঠেছি রাতেরাতে
জ্যোৎস্নায় ফাঁস পেতে আছে—জেড-পাথরের নিথর দু'চোখ

শৃঙ্খল

ভাঙা উইল্ডমিলের পাশে মাথা তুলে ছায়ার মমিরা, আর তিনদিকে
ঋতুর বিষাদ এসে ঢেকে আছে···এর মাঝে আমি উল্টে রয়েছি
গাঁ ছেড়ে কতোটা বাইরে এসব? যে বেনুনী মেঘ আমার শবের খোঁজেতে
চষে ফেলে গ্যাছে—তাও চক্রের দোষ নয়, আয়নাক্ষিয়ার থেকে
তারা খসে নেমে এলো ধাতুর কেশরে···তোমার গণনা তবে নির্ভুল!
পোড়া ভুট্টার ক্ষেতে পাখীদের আর উড়তে যাবেনা দ্যাখা? কেবল
অবশ পিণ্ডের মতো তলিয়েছি একা—শূন্যে শূন্যে
ঘুরন্ত চাকায় ভেসে মৃত্তিরা জ্বলে উঠবে আবার কাঠের সিলিং ফেটে
গায়েগায়ে। বের হয়ে আসবো না তবে খনিজ-আকরিকে গড়া চোখ নিয়ে!
হিমায়িত স্তূপ···শুধু দেখি—সারি সারি পঙ্গুরা দাস হয়ে আছে তার

সাতার

মাছের হৃদয়ে সূর্য তুষার চৌধুরী

তোমার পেরেক ছিল সুইসুতো লুণ্ঠিত বন্দুক
জঙ্গলে লুকোনো ছিল রক্তকুয়ো উলঙ্গ কুড়াল
নক্ষত্রমালায় তুমি ঝুলিয়েছ কঙ্কালের মুখ
বৃষ্টির শিকড়ে ভুলে ফেলে গেছ অক্ষর রুমাল

পোকার দঙ্গল কেঁদে ফেরে লিঙ্গে স্যুটকেসে স্তনে
বিস্তীর্ণ ফাটল ছিল স্বপ্নফাঁক কূট মফস্বলে
মাছের হৃদয়ে সূর্য জলরেখা আ মরি আমনে
ভুতুড়ে হাপর পেট শস্যশিস শাদা হাড় জ্বলে

আমাদের নারী ১

নারী যতক্ষণ জাগে আকাশ কোথাও
নজরে আসে না
নারী যখন ঘুমোয়
চাঁদ ওঠে
চাঁদের প্রভাবে ওঠে কবি আর
কবির কলম খাতা মাথা জুড়ে গিয়ে
কবিকে ছলনাময়ী আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে
একমাত্র কবিই জানে মোরাম মাধবীলতা মায়া ও মাংসের
হাড়িকাঠ
কবির মুখের মধ্যে দেখা দ্যায়
ক খ গ ঘ
বর্ণমালা
পুঁজিপতিদের জিভ ভুলক্রমে চেখেও দ্যাখেনি
কবির বর্ণাঢ্য বমি
স্বয়ং কবিই চাখে
চোখে তার অপার নীলিমা
যেই জেগে ওঠে নারী
মরে কবি আকাশও উধাও

বাবা

আমার বাবার ধর্ম হিন্দু
মধ্যযামে চাঁদ ডুবে গেলে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বাবাকে
গীতার বদলে গীতগোবিন্দের চটি সংস্করণ পড়তে
দেখেছি বলে কি আজ আমার অধর্ম
এত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ?

আমার বাবার ধর্ম মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ পাবার কৌশল
রামকৃষ্ণ কথামৃত যতটা সান্ত্বনা তার অধিক রগড়
কিন্তু গীতগোবিন্দকে বাহাত্তুরে আঁধারে জোনাকি বলা যায়

অন্য শতকের যুবকের প্রতি হেমন্ত আঢ্য

আজ এখানে একটি মৃত্যুকামী যুবক ঘোরে অল্পায়ু নরকে
রাত্রির শহরে
যেন মর্গপলাতক লাশ পুরোনো বাসনায় দেখে ম্লান জন্মভূমি
জীবিকাবিহীন জগতে সমাবর্তনের খোঁজে নেমে পড়ে খোলা নর্দমায় বেশ্যাপাড়ায়
মস্তিষ্কের কোষে সুযোসন্ধানী কীট উঠে এসে
খেয়ে ফেলে তার
ছেলেবেলা, দারুব্রহ্ম স্বদেশ, কাব্যবাণী

নষ্ট, প্রব্রজিত প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা ছিল স্বদেশে ও বিদেশে
লুপ্ত ও জীবিত জীবাণুসন্ধানে
'আমাদের শরীরে সামাজিক কুষ্ঠ, অতএব মানবসমাজে,
কী আসে যায়'
আট বছরের অনেক পরে মর্গ থেকে উঠে এসে ছদ্মবেশী লাশ
শহরে ঘোরে ঘৃণিত বিস্ময়ে

তুমি উজ্জ্বল যুবা যদি ডাক দাও পুরোনো শতকের শেষে
যদি বলো নদী স্পষ্টগামিনী এখানে, ধর্মযুদ্ধ নেই
একটিও দাবিহীন মৃতদেহ নেই
শিশুরা বসে তোমার প্রবৃদ্ধ শান্ত মুখশ্রীর খোঁজে
হয়তো সে বেঁচে যাবে।

কাঙালের ঘোড়ারোগ শ্যামলকান্তি দাশ

লাউটাউ পছন্দ নয় আমার
তবু সেই সকাল থেকে আমার সর্বাঙ্গে
কেমন যেন একটু বৈরেগী ভাব, বাপধনকে আর ঠেকিয়ে
রাখা যাচ্ছে না।
আমি এখন একটা আস্ত গোমুখ্যু ছাড়া আর কী!
একটা হারগোড়ভাঙা দ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়!
পাখি বউ বালবাচ্চা কবিত্বের ছেঁড়াকাঁথা—সব কিছু ছেড়েছুড়ে
আমি এখন সংসারের সাত হাত বাইরে চলে এসেছি।
বাইরে এসে কি খুব বড়ো কিছু একটা লাভ হল আমার?
আমি কি রাতারাতি বনে গেলাম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার
মহান অধিপতি? নাকি দুমদাম একটা ল্যাজ গজিয়ে গেল আমার?
নাকি চারটে শিঙ?

একেই বলে কাঙালের ঘোড়ারোগ!
যেতে চাইছি, কিন্তু কোনোদিকেই যাবার রাস্তা খোলা নেই
দু'দিকেই এখন টলটল করে উঠছে ভূতের মতন কালো জল
অস্থানে-কুস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে খাড়া পাহাড়
আর জঙ্গলের আখাম্বা গতর
পেছনে মস্ত মস্ত মায়া, দিব্য গূঢ় বিশাল আবছায়া,
জট আর রহস্যের তন্তু
এত সব চিত্তির বিচিত্তির টপকে কোথাও যাওয়া যায় না
লাউ-টাউ পছন্দ নয় আমার, তবু সেই সকাল থেকেই
আমার সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা পালাই পালাই ভাব ফুটে উঠেছে

দুঃখে কোথাও কেঁদে উঠছে একটা তেলেভাজা কুকুর
কাঁদুক, কুকুর বলে কি মানুষ নয়?
এইসব দেখেশুনে ভিতরের মালমশলা ছিদ্র টপকে মাথায় উঠেছে
দিকে দিকে বাড়িয়ে দিতে চাইছি হাত, হাতের কাটাকুটি—
যতক্ষণ না এই হিজিবিজি ফুঁড়ে রবি কিংবা বৃহস্পতি
দন্ত কেলায়িত করে চাগড়ে উঠছেন
যতক্ষণ না ফণা তুলছেন শুক্রের বন্ধন কিংবা সোলেমানের আংটি
কারুর সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই।

ডোম পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রসাভিলাষিণী গঙ্গা, বটপল্লব, শিলা, বিষ্ঠা, মালাচন্দন, স্থানীয় মস্তান,
ভিখারি, মৃতদেহ, হরিধ্বনি, জিলিপি, চা, পুরানো কেক, ইলেকট্রিক চুল্লী,
দেয়ালে চক দিয়া লেখা নাম, খই, কলসী, ছাই, অয়েলমিল, বাঁশ হাতে
চণ্ডালের সুখমুহূর্ত, উড়ন্ত অঙ্গার এবং স্নানকর্তৃক নগ্নতায় নড়িতে-থাকা
রমণী—এইসব উপাদানে যেসকল লেখা আমি তৈরি করি তাহা অনশ্বর
কি না প্রশ্ন থাকে। কেননা, ইহার মধ্যে কফিন ও কবরের সুমিষ্ট
কূটতা নাই। ব্রীজ বা গঙ্গার দূরবর্তী বাঁক অধিকতর কি না, শ্মশানযাত্রীদের
বিশ্রামনিবাসে ইহা লইয়া আলোচনা হয়।

আলোচকেরা পটুয়া।

তাসার ভিতরে, আমি, আমার মগ্নতা পাইয়াছিলাম, এখনো পাই।

ঘাম অনির্বাণ লাহিড়ী

হাওয়া,
এমন হাওয়া, যা টের পায় না শরীর
শুধু ওই দরজা, ভেজানো দরজা
আস্তে খোলে
মৃদু ক্যাঁচকোঁচ, ধাতুর
তারপর হাওয়া, যে হাওয়া টের পায়নি শরীর,
নেমে যায়
বন্ধ হয় দরজা, তার সংক্ষিপ্ত, বিশেষজ্ঞ ধ্বনি
স্থির গুমোট, শরীরে
যদিও হাওয়া আছে, চলাচল আছে, প্রমাণ আছে,
গড়িয়ে নামে ঘাম,
ঘামও প্রমাণ

একবার দরজা অনেকখানি খোলে,
লম্বা ক্যাঁচ
মনে হয়, কেউ এলো

তারপর বন্ধ হয় জোরে,
এতো জোরে, যে কেউ আসেনি
খোলে আস্তে, সন্তর্পণে,
বন্ধ হয় জোর, বারবার
তবু
শরীর অক্ষম,
ঘামে

নির্বাচন

শুরু হয়, তাস
হঙকঙ থেকে ভেসে এসেছে এই তাস, চোরাই জাহাজে
দৃশ্যের ওপরে দৃশ্য, বাহান্ন বাগান, হঙকঙের—
ঝুলে পড়া ব্রিজের নিচে প্যাগোডার ফোয়ারা,
আর, লাফিং বুদ্ধ

নির্বাচন, ধূলিময়
নির্বাচন, ঘোষণা ও চলাচলময়
এদিকে, ত্রিপলের গন্ধ থেকে, গুণচট থেকে কিছু দূরে,
জাম ও নিমের নিচে,
প্রথম ঘোষণা যারা ফাঁকি দিতে চায়,
সেই সংরক্ষিত বাহিনী, নির্বাচন কর্মীদের—
শতরঞ্চির যেখানে শেষ, সেইখান থেকে শুরু হয়েছে খবরের কাগজ
জ্বলন্ত বিড়ি গিয়ে পড়লো ছেড়ে-রাখা কেড্‌সের ওপর
পুড়ছে লাল মোজা, শখের
তাস, বাহিনীকে চতুষ্কোণে বিভক্ত করেছে—
নির্বাচন, ধূলিময়
নির্বাচন, ভাতের হোটেলময়

তাস চলে, আর জামের নিমের পাতা ফাঁক ক'রে
একেকবার নেমে আসে থাবা
পুরোনো হ'লো বালিশ, তবু এখনো
ভেতর থেকে হাওয়া বেরোয় যখন,

কিছু গুঁড়োও বেরোয়—
শাদা গুঁড়ো, কিসের জেনে নেওয়া হয়নি কখনো
তাড়াখাওয়া শতরঞ্চির ভাঁজে ভাঙতে থাকে হাতপাখা
স্থগিত, মোজার জন্য শোক

জামের বৌল ছিঁড়ে গন্ধ নেবার ভূমিকা যার,
বর্গক্ষেত্রের কিনারায় শুয়ে থেকে,
যে এতোক্ষণ স্পোকের ফাঁকে লক্ষ্য করেছে বিধবার চায়ের দোকান,
তার পাশে মোজা উন্নয়ন, তার লাল কোটর,
মাইক্রোফোন, জাম ও নিমের আড়ালে, তার চোখে পড়ে এবার
মাইক্রোফোন, তার ধাতুদাঁত, তার শিস্
মাইক্রোফোন, হাওয়ায় মৃদু কাঁপছে, তবু
স্থির

পরিচিত মুখ থেকে যেভাবে চোখ সরিয়ে নিতে হয়,
সেইভাবে,
সে সরিয়ে নেয় চোখ,
দেখে, একটি নরবলির পর
জমে উঠেছে, আরো জমে উঠেছে পরজন্মের তাস,
প্যাগোডার ফোয়ারা উঠেছে ঝুলে পড়া ব্রিজের ওপর
আর, লাফিং বুদ্ধ,
বুদ্ধের টাক, বুদ্ধের ভুঁড়ি, বুদ্ধের স্তন, বুদ্ধের চর্বি—
হঙকঙ থেকে ভেসে এসেছে,
হঙকঙ থেকে হেসে এসেছে এই বুদ্ধ,
চোরাই জাহাজে

প্রতিবাদের সাহিত্য শৈলেশ্বর ঘোষ

এই রচনাটি জিজ্ঞাসা, সংকলন ৬ : অক্টোবর, ১৯৭৪-এ ঠিক 'ন বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো। আমরা এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত ক'রে লেখকের সত্য-উচ্চারণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরি মনে করছি—যদিও লেখাটির মধ্যে বিতর্কের প্রচুর অবকাশ রয়ে গ্যাছে।—অজ্ঞাতবাস

আমাদের সমাজে, অর্থাৎ এই বাংলাদেশে কবিতা অধিকাংশের কাছে এক ধরনের মনোরঞ্জন মাত্র। এক সময় জমিদার বাবুদের দ্বারা পালিত কবিরা তাদেরই ইচ্ছা পূরণ করে যেতেন—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা পয়সালোভী গবেষকরা গবেষণা করতে পারছে—ঐ সব কবিদের রচনায় সমাজ বাস্তবতার কতটা অংশ আছে বা আদৌ নেই ইত্যাদি। কিন্তু আমি সাহিত্যের আর একটা অংশের কথা বলতে চাই যেখানে সে ঐ মনোরঞ্জকের ভূমিকা নিতে অস্বীকার করে। কবিতা সেই না-সূচক (কিন্তু অস্তিবাচক) সাহিত্যের একেবারে সামনে রয়েছে। আজ যে কিছু কিছু সচেতন পাঠকের মুখ থেকে এ অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে বাংলা কবিতায় কিছুই হচ্ছে-না, সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমি প্রায় ১০ বছর সেই একই ধরনের ছন্দ, সুর, স্যুডো-রোমান্টিকতা—বানানো এবং কষ্টকল্পিত কথাবার্তা—অস্তিত্বের ভয় থেকে সরে পড়ে একজন কবি হতে চাইছে সহজ সুখের মধ্যে—সত্য অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা আর নাই তার বা হয়ত সত্য কোন অভিজ্ঞতা নাই তার। এই শ্রেণীর কবি লেখকরা কত পপুলার—এরা যা লেখে হাজার হাজার লোক তা পড়ে—হয় এদের লেখা পড়ার জন্য ১০ টাকা দামের পত্রিকা কেনে বা ২০ টাকা দামের পত্রিকা কেনে বলে এদের লেখা পড়ে, তাই এরা জানে জমিদার বাবুদের মান ও মন রাখার জন্য তাদের ইতিকর্তব্য কি। অথচ ৪০ বছর বয়স অব্দি রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার কত পাঠক ছিল ? ক'জন বড় প্রকাশক তিনি পেয়েছিলেন, ছোট প্রকাশকের তাক ভর্তি শোভা পেত রবীন্দ্রনাথের বই—সে তুলনায় আজকের সাহিত্য ব্যবসায়ীগণ কত সাকসেসফুল ! 'লেখক-বেশ্যাদের ব্যবসা চালাইবার অধিকার আছে' কিন্তু আজকের সমস্ত সাহিত্য ব্যবসায়ী সুন্দরভাবে ধাপ্পাবাজ ! তারা সাহিত্য, শিল্প, ফর্ম, ছন্দ, আর্ট—নিয়েই তাদের কারবার ফেঁদেছে। সামনে রয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান পাঠককুল—যারা মূলতঃ রোবোট। সাহিত্য আন্দোলনগুলিকে ভাঙিয়ে এদের অনেক অনেক দিন চলে যায়—যাবে। এর পাশাপাশি আমরা শতকরা ১ জন এমন পাঠককে চাই যারা এ সময়ের প্রকৃত বুদ্ধিমান পাঠক—যারাই পরবর্তী জেনারেশনের স্রষ্টা হবে।

আমাদের সমাজ সঠিকভাবে অপ্রেসিভ, ব্রুটাল ও মস্তিষ্কহীন। ব্যবসায়ী, দালাল,

পুলিশ, বেশ্যা, মিথ্যাবাদী রাজনীতিক, ষড়যন্ত্রকারী গুপ্তচর বাহিনী ও খবরের কাগুজে কবি-লেখকদ্বারা ধর্ষিত এই অনড় এসটাবলিশমেন্ট ! আমরা প্রায় সকলেই সেই সৎ ব্যক্তিটির কাহিনী শুনেছি যে কিনা ঘুষ খাবেনা ঠিক করেছিল, এটা সে পারেনা বলেই কিন্তু সে দেখল তার আপিসের সকলেই ঘুষ খায়—এই অবস্থায় হয় তাকে ঘুষ নিতেই হবে (সময় মত সকলের টেবিলেই টাকার ঠোঙাটি এসে যায়) অথবা অক্ষম ও অযোগ্য বিশেষণে ভূষিত হয়ে বিতাড়িত হতে হবে—কোন কোন গল্পে একে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর সে হয় সারেনা, না হয় পাগলের ভাণ করে বেঁচে থাকে—এইটিই ভারতবর্ষের মূল পরিচয়। হুঁ, যদি এই এসটাবলিশমেন্টে ঢুকে পড় তবে সবই পাবে, বাড়ী পাবে, গাড়ি পাবে, সম্মান পাবে, অমরতা পাবে (এরপর আর কি চাও ?) সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে ! একবার যদি তুমি রাজা হও তবে বংশপরম্পরায় রাজা থেকে যাবে, একবার তুমি মন্ত্রী হলে তোমার ১৪ পুরুষ মন্ত্রীর হালে থাকবে। এই প্রসেসের মধ্যে ঢুকে পড়তে যদি কেউ অস্বীকার করে, যদি বলে ট্র্যাডিশন আমি মানিনা. একে ভাঙবার চেষ্টা করব আমি—তখনই সর্বনাশটি ঘটে যাবে—সে কবিতা লেখার ক্ষেত্রেই হোক আর রাজনীতির মধ্যেই হোক,—নির্বাসন, নির্বাসনে চলে যাও কাফের ! (কত হাজার রাজনৈতিক বন্দী ভারতবর্ষের জেলখানাগুলিতে পচে মরছে—জেলখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। মাঝে মাঝে হিন্দি সিনেমার সাজানো গল্পের মত জেলের পাঁচীল টপকাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরছে—এবং কত কবি-লেখককে এই এসটাবলিশমেণ্ট গুড়ো করে দেবার চেষ্টা করছে !)

হ্যাঁ, যা বলার জন্য এই লেখা—যারা আজ কবিতা লেখে তার সকলেই কি মনোরঞ্জক হতে অস্বীকার করছে, না—দুচারজন মাত্র। পিছনে মুখ ফিরিয়ে একবার রবি ঠাকুরের দিকে তাকান যাক্। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এমন কিছু কিছু রচনা আছে যাকে বলা যাবে তখনকার ইতিহাস ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, খুবই স্পষ্ট ভাষায় এই প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিলেন—এমন কি জগতের ন্যায় ও সত্যের ধারণা সম্পর্কেও তাঁর গভীর সংশয় দেখা দিয়েছিল, যদিও তাঁর রচনার বড় একটা অংশ উপনিষদের সেই সংক্রামক অস্তিবাদে আক্রান্ত—মনে হয় জীবনের শেষদিকে এসে জগৎকে আর উপনিষদের দৃষ্টিতে না দেখে নিজের দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছিলেন, যে কোন প্রকৃত কবিরই কাজ তাই—তাই দেখা দিল সংশয় ও প্রতিবাদ—তবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রতিবাদী, সেখানে দুর্বল তার রচনা, জীবনের কোন মূল বিন্দু পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু মনে হয় অন্য ভাবে কিছু গুরুত্ব আছে এই প্রতিবাদের বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্যে অন্তত—গুরুত্ব এই জন্য যে সচেতন ভাবে প্রতিবাদের সাহিত্যের সূত্রপাত এখান থেকেই, এবং আমরা ভুলতে পারিনা যে রবীন্দ্রনাথ এই সব লেখা লিখেছেন জীবনের শেষ দিকে। কিন্তু প্রায় ঐ সময়েই যিনি সমগ্র রচনাকে প্রতিবাদী করে তুলেছিলেন তিনি জীবনানন্দ। তিনি লিখেছিলেন, 'মরনের পরপারে বড় অন্ধকার এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো' —এখানকার প্রেম, প্রগতি, আলো, ইতিহাস, কর্ম, প্রচেষ্টা, শান্তি স্থাপন, মিলন,

ভালোবাসাবাসি সবকিছুই তার কাছে এক অতি জটিল অন্ধকার বলে প্রতিভাত হয়েছিল, সমস্ত সৃষ্টির চাঁৎকারকে মনে হয়েছিল, শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর। সেই সমস্ত কবিতায় আর আলাদা করে চেনা যায় না বিষয় হিসাবে রাজনীতি বা অপ্রেম বা বেশ্যাবৃত্তির কালো অঙ্গার বা শোষণের নিকষ বিষ, সবই এক অস্তিত্বে মিলে একাকার জটিলতা লাভ ক'রে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘতম শব্দস্রোত-এ—সে এক মূলতঃ সত্যকে বহন করে নিয়ে আসছে আমাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে—সেখান থেকে আরেক, আরো এক হৃদয়ে ও এক মস্তিষ্কে—এক প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলতে চাইছে আরো আরো হৃদয়ের প্রতিবাদ, বাংলা কবিতার যদি কোন সত্য ধারা আজ গোপনেও বহমান থাকে তবে তা সুনিশ্চিত ভাবেই প্রতিবাদের—এই সমাজে, এই বিকারে, এই জীবনে, কবিতার অন্য কোন রূপ সম্ভব বলে মনে করি না। কৃত্রিম আর্ট প্রতিবাদীর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত খুবই নগন্য। এখনও পর্যন্ত ব্লকহেডেডরা যা যা লিখে চলেছে, যাদের বলা হয় প্রলিফিক রাইটার—রোবোট পাঠক কুল গোগ্রাসে তাই গিলে চলেছে।

মধ্যবিত্ত রোবোট পাঠক সম্প্রদায়ের মিথ্যা পূজায় আহুতি দিয়েই শুরু করে অধিকাংশ-রা এবং শেষ করে অহেতুক কান্নাকাটি ও রিক্সাওয়ালার ফিলসফি দিয়ে। প্রতিবাদ যে হিংস্রতার মুখোশ খুলে দেয় এবং এই রিপ্রেসিভ সমাজের মিথ্যা পূজাকে ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুরভাবে চাউর করে দেয়—মধ্যবিত্ত তাই এই প্রতিবাদ জিনিষটিকে ভাল চোখে দেখে না। আমরা ছোটবেলা থেকে বাবাদের মুখে শুনে আসছি, রাজার বিরুদ্ধাচরণ কোরোনা—টিকে থাকার এই অশ্লীল পদ্ধতি ভারতবাসীর মজ্জাগত হয়ে আছে—শতকরা ৯৫ জন কবি-লেখক (!) নিজেদের মজ্জায় এই বিষ বহন করেই আসে লেখক হতে। জীবনের পয়েন্ট থেকে পয়েন্টে প্রায় যে এই রাজনৈতিক কূটচক্র কাজ করে তা বুঝে নেবার দরকার হয় প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের, অবশ্যই কবিকে, লেখককে, না হলেই তাকে ঢুকে পড়তে হয় সেই জগতে যেখানে একটি লেখা ৪ লক্ষ পাঠক পড়ে ও আরও পড়তে চায়, ফলে সম্পাদক চায় ফলে বড় প্রকাশক চায় ফলে টাকা আসে, ফলে সুখ আসে ফলে নাম হয় ফলে সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ে ফলে অমরতা লাভ হয়—চমৎকার প্রসেস! বলা যায় এই অবস্থায় যারা প্রতিবাদী তাদের স্বর পাশবিক হতে বাধ্য—এবং সেই সব শব্দ তারা ব্যবহার করবেই যা মধ্যবিত্ত পাঠককে বমি করিয়ে ছাড়ে, তারা বমি করে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে এই প্রতিবাদীদের উপর—তাঁদের হিংস্র নখগুলি বসে যায় তাদের শরীরে—প্রতিবাদীরা তবু কিন্তু এই রোবোট সম্প্রদায়কে এতটুকু শ্রদ্ধা করে না; মূল্য দেয় না তাদের রুচিকে, তাদের মূল্যবোধগুলিকে ক্রমাগতই নষ্ট করে দিতে থাকে—হন্টাইল করে তাদের, জীবনের সেই সব লুকান সত্যকে অকাতরে প্রকাশ করে দেয় যা রোবোটদের স্বস্তি দেয় না—পাপীদের বলে তোমরা তোমাদের পাপ চিনে নাও!

'দেশ পত্রিকা কোলে নিলেই থোকা কবির কান্না, ফ্রাসট্রেশান, প্রতিভা থেমে যায়' (চিঠি)—উৎপলকুমার বসু—আমরা জানি কি নিষ্ঠুরভাবে সত্য এই কথা। কর্মাশিয়াল

সমাজের বাই প্রোডাক্ট এইসব থোকা কবি ও মাথামোটা লেখক সম্প্রদায় কিভাবে আজ সাহিত্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে—খুব সফল ব্যবসা! এই সর্বব্যাপী লোভের চিত্রটা আজ ভয়ংকর—গোটা ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-শোষকদের লোভের চেয়ে এদের চরিত্র আলাদা নয়—ভয়ের কথা যে এরা বাজারি, কিন্তু ভাণ করে সতীরা এরা থার্ডগ্রেড কিন্তু আভাগর্দ হবার ভাণ করে এবং এরাই এইভাবে আজকের বাংলা সাহিত্যের ফ্যাসিস্ট শাসক অনেকে অবশ্য কখনও কখনও নামাবলী দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রাখে, নামাবলীটায় টান দিলেই কোন কোন কুখ্যাত রাস্তার ছাপ ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথে যে কোথাও কোথাও স্থূল প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল, তার রকমফের এখনও রয়েছে—এখনও রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিবাদের কবিতা, অঙ্কের দিগ্গর কাভালু কবিদের মধ্যে অনেকেই এই ধরণের লেখায় অভ্যস্ত—আর কিছু সস্তা সমালোচকও আছে (আছে এখানেও) যারা এই সব রচনাকেই যথার্থ বিদ্রোহী বলে মনে করে। তবে ভিয়েৎনাম বিষয়ে লেখা একটি প্রতিবাদের কবিতার কোন মূল্য নাই তা বলা সম্ভব নয় কিন্তু এ কথা তো খুবই সত্য যে ভিয়েৎনামে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও শক্ত হতে পারে ভিয়েৎনাম বিষয়ে তোলা একটি ফোটোগ্রাফ প্রদর্শনী বা চলচ্চিত্র বা সংবাদপত্রের সত্য রিপোর্ট। অর্থাৎ ভিয়েৎনাম বিষয়ে গণমানুষের ক্ষোভ সঞ্চার করার জন্য আরও অনেকগুলি মাধ্যম বর্তমান। একজন কবিও যদি নিজেকে আর একটি অতিরিক্ত মাধ্যমরূপে ঐ বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন, তাতে কারুরই আপত্তির কিছুই থাকে না। কিন্তু জীবনের সমগ্র নোংরামীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাই সার্থক—যে প্রতিবাদ জীবনানন্দের রচনায় ছিল, ছিল র‍্যাঁবোর রচনায়, ছিল সিলিনের রচনায়, আছে আর্তোর রচনায় এবং আরও কারও কারও—জীবনের সুদীর্ঘতম কারাবাসে অস্পষ্টতম অন্ধকারে আত্মার গোঙানী ও গর্জন এরা জানে, জানে যে আমাদের ভাগ্য কারাগার থেকে কারাগারে হেঁটে যাওয়া এবং—মনের এমন এক মুক্তি—যা অনুভব করে এপারেও যে অন্ধকার ওপারেও সেই অন্ধকার—জানে সে আকাশের নক্ষত্র আকাশেই ফিরে যাবে, এই গণিতকালয়ে সে থাকতে পারে না,—এদের শরীরে থাকে অসম্ভব সমস্ত ক্ষতের চিহ্ন, ধারাবাহিক অপরাধের চিহ্নগুলি তাদের সহজেই চিনিয়ে দেয়—এই চিহ্নগুলি চোখে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচে, জীবনানন্দের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে, র‍্যাঁবোর নির্বাসনে, অপরাধী সমাজ তার দেহ থেকে কিছু কিছু কোষ উপড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচতে চায়—র‍্যাঁবোকে উপড়ে ফেলেছিল সুদূর আফ্রিকায়, মনে পড়ে আরও নিষ্ঠুর মর্মভেদ করুণ সমস্ত আত্মবিসর্জনের কথা, নিপীড়িত, হতভাগ্য উদ্ধত ও বিজয়ী সমস্ত আত্মার নিদারুণ বেদনার কথা—রোমাঞ্চকর লুই ফার্দিনান্দ সেলিনের কথা একই সংগে সে মার্ক্সের মূলতত্ত্ব বুঝেছিল ও ইহুদীদের ঘৃণা করেছিল, হিটলারের অনুগত হয়েছিল ও দারিদ্র্য, শোষণ ও নিপীড়ন বিষয়ে লিখেছিল, সে ছিল কাপুরুষ, দেশদ্রোহী ও তথাকথিত মানবতার শত্রু—সে লুই ফার্দিনান্দ সেলিন। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে সে আজও নির্বাসিত কিন্তু

পতিতাদের ঈশ্বরের মতই দিয়ে চলেছে প্রেরণা ও উত্তেজনা। তারই জগৎ থেকে জন্ম আর এক প্রতিবাদীর—তিনি জাঁ জেনে। শতধিক এই শ্বেত ইতিহাসে—আমরা কালো সাহিত্যের পক্ষপাতী। সেই সাহিত্য জীবনের আন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনা-গুলি মুক্ত করে দেবে—কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনা মূলক সৃষ্টি যদি কালো হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবে সেজন্য সাহিত্যকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই—জীবনই এজন্য দায়ী, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি এই তমসা লুকিয়ে নেই ?—এই অন্ধকারই সচেতন বাস্তবতার প্রতিটি ঘটনার পেছনে সক্রিয় শক্তি—তাই এই সামগ্রিক জটিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মধ্যেই কবির অস্তিত্বের মূল্য প্রতিপন্ন হয়—স্থূল ঘটনা কেন্দ্রিক প্রতিবাদের কবিতা মূল্যহীন হয়ে যায় ঐ ঘটনা পুরানো হওয়া মাত্রেই কবিকে এই রোবোট সমাজ অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করে দিতে পারে তখন জং ধরা নাটবল্টু হিসেবে ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে কবিকে—কিন্তু প্রতিবাদ সামগ্রিক হলে, জীবনের মূল পয়েন্টগুলি তা স্পর্শ করতে পারে তবে কোন সমাজই তাকে উপেক্ষা করতে পারে না, রিএ্যাকট করবে, কবিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করবে, জেলে পুরে দেবে, খুন করে ফেলবে, কমপক্ষে নির্বাসিত করবে।

আজ যে মাঝে মাঝেই শোনা যায় কবিতা বন্দুকের নলের চেয়ে শক্তিশালী নয়—অন্তত পশ্চিমে এ রকম জীগির খুব—তার কারণ এ রকম হতে পারে যে, ভাষা যখন প্রতিবাদ করতে পারে না, জড়, অক্ষম, ধর্ষিত হয় তখনই প্রতিবাদরূপে অস্ত্র নিজেই একটু স্থূল মূর্তিতে এসে পড়ে ও ঘোষণা করে কবিতা যা পারেনা আমি তা পারি। সে যে পারে না তা নয়—কিন্তু সে যা পারে তা সুদূরপ্রসারী হয় না, যথার্থ কবিতা হয় সুদূরপ্রসারী, জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করার শক্তি তারই আছে, আছে সেই ভাষার যাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে হাত পায়ের শেকল থেকে। নূতন এই ভাষারই থাকে সভ্যতার পচনধারা শরীরে ঝাপিয়ে পড়ার শক্তি। ভাষা ঢুকে পড়ে রক্তে কাজ শুরু করে মাথায় ও হৃদয়ে—হয় মেটাবলিক পরিবর্তন অন্যদিকে বুলেট একেবারে নিঃশেষ করতে চায় কিন্তু ভুলে যায় পৃথিবীর মধ্যে যে অন্ধকার রয়ে গ্যাছে কেবল ব্যবস্থাকে পাল্টালেই তার সবটা মুছে যাবে না, সে জেগে উঠবে আবার অন্য আকারে—কিন্তু ভাষা সেই শক্তি যা শেষ পর্যন্ত জেগে থাকে ও লড়াই করে যায়। শুদ্ধতার এই যে পূজা তারই অন্য নাম প্রতিবাদ ! আজ ধূর্ত ব্যবসায়ী ব্যবসা ফলাও করার জন্য জালি প্রতিবাদ নিয়ে কারবার করছে—তারা জানে কখন কোন মাল ভাল কাটে—এখন তাদের ক্লান্ত পাঠকরা অন্য কিছু চায়—তখন প্রতিবাদী সাহিত্যের থার্ড ডিগ্রি ইমিটেশন তারা বাজার চালু করে (বামপন্থীদের শ্লোগানগুলি যে ভাবে কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তা স্মরণীয়) কিন্তু ধাপ্পা আর চালাকি চিরকাল চলেনা।

জীবনের অন্তর ও বাহিরের এই ঘৃণ্য চেহারাটা দেখার পর হয় পলায়ন করতে হয় না হয় তাঁর প্রতিবাদ করতে হয়। আধুনিক মানুষ প্রতিবাদ না করে পারছেনা। শুধু বাংলাদেশেই নয় গোটা পৃথিবীতেই প্রতিবাদী সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। 'দর্পণে

নিজের মুখ' দেখাই এখন আর যথেষ্ট নয় এর ঘৃণ্যতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই অস্তিত্বের অস্তিবাচক আর্ট। শ্লেষাজড়িত ছন্দবন্ধনে গ্রথিত ন্যাকামীকে কবিতা বলে মনে করিনা আমরা—শব্দকে স্থানচ্যুত করে তাদের নতুন শক্তিতে এনে ফেলাই প্রতিবাদ—জীবনে এই হ'ল অন্তর্ঘাত। এই প্রতিবাদী, অন্তর্ঘাতীর সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সাহিত্য—ব্যবসায়ী মধ্যস্বত্ব ভোগীদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আমাদের সামনে এখন এই কাজ !.

বিগত প্রায় আঠারো বছর ধ'রে কবিতা লিখছেন নিত্য মালাকার। এক যুগেরও কিছু বেশি উত্তরবঙ্গের এক দুর্বৃহ গ্রামে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত, লাজুক, অভিমানী ও সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ এই কবি খুবই কম লেখেন—কিন্তু নিজেকে নিঃশেষ ক'রে লেখেন। বছরে, গড়ে একটি কি দেড়টি ক'রে পদ্য তিনি হয়তো-বা লিখেছেন। এই বিরল-প্রতিভা কবির একটি মনোহরণ কাব্য পুস্তিকা খুব শিগ্‌গিরই প্রকাশিত হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের পক্ষ থেকে।

অপেক্ষা রবীন্দু বিশ্বাস

এত নোংরা মেখেছি ধোব, জল নেই !
ডালি হাতে বহুলোক চাতালে দাঁড়িয়ে,
আপনার কাছে যাবে, পরিচ্ছন্ন বেশবাস,
মিষ্টি গন্ধ, আমিও ওদের সঙ্গে কাকভোরে উঠি ॥
হয়তো বা ওদের কারো আগেই উঠেছি,
নর্দমাটা পেরোতে পারিনি।
এত নোংরা মেখেছি ধোব, জল নেই !
এই ভাবে যাবো ? ওরা তা দেবে না,
যারা ধুয়ে মুছে সারিতে দাঁড়ালো।
আমি তবে এইখানে থাকি ;
সময় সমস্ত ধুয়ে দেবে।

হতভাগা

হত্যা দিয়ে ছিল লোকটা আপনার বাড়ির সম্মুখে,
অনেক দুঃখীর সঙ্গে নাটমন্দিরে শুয়েছিল।
জীবন মেরেছে তাকে, সে কিন্তু জীবন ছাড়েনি।
আকাশ ওড়ালো ঝড়, পায়ের তলার মাটি
কুপিয়েছে লোক ; হাঁটুভাঙা তবু তার ভ্রমণে আগ্রহ,
পাখির দোলনা গাছে গাছে, পাহাড়ে শ্বাপদ,
নদীর অশ্রয়ে মাছ, শ্যাওলা ও নুড়ি,
সমুদ্রের ঢেউয়ে দান টান। লোকটির ইচ্ছে হ'ল শোবে,
আঁচারে উদ্‌গার তুলে, ঘরদোর বাগান বানাবে এবং মিনার ॥

কার ছায়া

কার ছায়া পড়ে না মাটিতে ? কার ছায়া ? আলো বুকে
যে দাঁড়ালো সে কিন্তু আলোর কাঙাল। তবু তার
কামনার রক্তমাংসে আলো লজ্জা পায়। আলোর ভিখারি !
বড় দীন ছদ্মবেশে এলে ! দ্যাখো ! পশ্চাতে কুটিল ছায়া।

কার ছায়া পড়ে না মাটিতে ? তার কি শরীর নেই,
হারাবার ভয়, অসামান্য দুটি একটি চাওয়া,
দেয়াল তোলেনি বুকে ? কে সে, কোথায় থাকে,
যার ছায়া পড়েনা মাটিতে ?

এখন হীরক ভট্টাচার্য

তোমার আমার মধ্যে একটা বিকেল চলে যায়
তোমার আমার মধ্যে একটা সকাল···
কথা নেই।

তোমার আমার চোখ, ভারী চোখ
মণি খুলে রাখে
আমাদের নীল হাসি, সাদা হাসি
ঠোঁট খুলে রাখে।
শব্দ নেভানো।

একটা হলুদ রঙ ধুলোর আকাশ
কালচে রক্তের ফেনা বমি করে
তোমার আমার মধ্যে ভেসে থাকে
শেকড় ছড়ায়···
যেভাবে আমার !

কুলটা

রেখে আসি গোলাপ কাঠের আঙরাখা, চাঁদ, রাঙা
পাতার আগুন, মাঠে, তবুও কুয়াশার ফ্যাকাশে
টোপর, রাত, গলে যাওয়া পুরনো অস্ত্রের টানা
ঠাণ্ডা পাটি। ধরো, ফিরতে না দিই যদি আকাশের
নরম পাতায় এই রাত্রিরই কালো কালো কণা,
তোমাকেও চিরতে দেবোনা, ধরো, আরো কালো ঘন
পরিখার ফোঁপানো ধুম আঁচ, তবে সব মন্ত্রণা
থেমে যাবে ? সন্ত্রাস, বাজবেনা ক্ষীণতর বন-ও !

মরা পাতাদের নিশ্বাসে তবে এই শেষবার-ই।
জ্যোৎস্না দুভাগ করে সাদা সিঁথিপথ শেষ বাড়ী
ছেড়ে গেল। আরো দূরে মাঠের গর্ভে তবু মাংসের
চিরাগ জ্বালিয়ে···, ওকে কুলটা বোলো না, গান শেষ
বাড়ী ফিরে যাবে ঠিক। শোনো, ঘরেতে মা বোন ভাই
ওরও-আছে, শুধু হাঁ মুখে নেভেনা রাত্তির তাই···

অলীক ডিঙি তপন ভট্টাচার্য

কেউ নেই ; শুধু এক রাতজাগা ক্লান্ত ডিঙি আর
ম্লান মুখ এক চোখো টেঁমি,
একা একা ফিরে আসে ফিকে নীল ভোরে
কোথায় আরোহী তার ?—ফাঁকা পাটাতন !

শূন্য গলুই ভরে শুয়ে আছে স্মৃতি,
মাঝরাতে ছিঁড়ে গেছে প্রত্যহের জাল—
এয়োতির শাঁখা-পলা কুয়াশায় ঢেকে আছে
ঢেকে আছে সন্তানের মুখ।

শ্মশান বাতাস শুধু হা হা হা করে ব'য়ে যায় ডিঙির ওপরে ।

মানুষের রক্ত দেবদাস আচার্য

নিজেরই শরীরের রক্ত হাতের তালুবে নিয়ে
চুপচাপ দেখি, তারপর
যাত উপুড় করে ফেলে দিই ঘাসে
পাখি শুঁকে দেখে, মাটি শুষে নেয়, আর
বাষ্প হয়ে ছড়ায় জলে স্থলে

নিজেরই শরীরের তন্তু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে
ধনুকে বেঁধেছি
লক্ষ্য স্থির ছিল, বহুদূর, তবু
বাতাসে বেঁকে গেছে তীর,

কতদূর গেছে ? কোন দিকে গেছে ?—ভাবি, তারপর
আবার একটি তীর ধনুকে লটকায় দূরের শব্দের দিকে লক্ষ্য করে

এই খেলা রহস্যের খেলা
অর্থ, পদমর্যাদাও যৌনতার চেয়ে একটু বেশি

একটু বেশি আমি চাই, তাই বারবার ভুল হয়
রক্ত ও শ্রম নিয়ম মানে না

পশু ভুল করে না কখনো, ব্রহ্মাও করেন না
তাঁদের কোনো অল্প নেই, তাঁদের স্মৃতি অনুর্বর
নিখুঁত ও সঠিক কাজ পশু করে, ঈশ্বরও করেন
তাঁদের কোনো বিস্ময় নেই, বিভ্রম নেই

মানুষ একটি কাজ ঠিক করে, নাটি কাজ ভুল হয়ে যায় তায়
বিস্ময়, বিমূঢ়তা সর্বদা উত্তেজিত করে
ঐ তারামণ্ডল, ঐ দূর নক্ষত্রের দেশ
সৃষ্টির চেয়েও একটু বেশি মনে হয়, মনে হয় বিশাল হৃদয়

শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়ে একটু বেশি
অদৃশ্য আলো ঘিরে আছে হৃদয়ের চারপাশে
মনে হয়
আর মনে হয়, হৃদয়েরও ইতিহাস আছে,
দীর্ঘ দিনের

বিস্ময়ের প্রাণীই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, জন্তুদেরও
হৃদয়ের ইতিহাস ঈশ্বরের চেয়ে একটু বেশি,
পশুর চেয়েও
মানুষের ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতির খেয়ালের চেয়ে
একটু বেশি
প্রকৃতি অনুরূপ চায়, মানুষ তা কখনো চায়নি

দীর্ঘ গরমের দিন, দীর্ঘ শীতের দিন অতিক্রম করে
একটু বেশি জয় হলো মানুষের
এই রক্ত, যা আমার হাতের তালুতে
শরীরের এই নুন, লোহা, ফসফরাস, কার্বনের মিশ্রণ
ঈশ্বর পাননি, আমি জানি

তখন সহসা কেঁপে ওঠে মন
তখন সহসা যেতে ইচ্ছে হয় দূরে
তখন সব কিছুই ছেনে, ছেঁকে স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে হয়

পশুর বিকার নেই, স্বপ্ন নেই, ভুল নেই
ঈশ্বরের বিভ্রম নেই, রক্ত নেই
মানুষের ভুল আছে, ইচ্ছা শক্তিও আছে, জানি

একগুচ্ছ কবিতা

আমার কুঠার অরুণ বসু

এই যে জঙ্গল এর গভীরতা আমাকে ভাবায়না আর একটুও
আমার কুঠার আমি ফেলে রেখে চ'লে যাবো
জঙ্গলের পথ চিরে নক্ষত্রের সবুজসঙ্কেত
যেখানে মিশেছে সেই সরলবর্গীয়বনে পাহাড়ের ধাক্কাপথে
আলোর বিনুনি
তুমি মুছে দাও আমি মানুষের কাছে যাবো একবার
বুকের ভিতরে আরো একবার যাবো
চলে যাবো অভিমানে কাউকে কোনো কথা না-ব'লেই
ভরে যাবে এ-পৃথিবী অহঙ্কারে মঙ্গলের তামাটে-সন্ধ্যায়
ঘাশে ও বেরালে পথ সারাপথ শুধু ফেউ বাঘ
থাবায় আঁচড়ে রক্তে সন্ন্যাসীর স্বর্ণাভিকরণ ঘট কমণ্ডলু দুধ গঙ্গাজল
প'ড়ে থাকবে তান্ত্রিকের কাপালিকের ল্যাঙট ও লালছোপ
মড়ার বীভৎস খুলি
ষট্‌চক্র
সিঁদুরের দাগ
সযত্ন বৃষ্টির ফোঁটা আকাশের ঘন কালো মেঘের শরীর দ্যুতি
আমাদের চোখে তার বাষ্প এসে ধাক্কা মারবে
জাগাবে আমাকে
আমি জেগে উঠতে চাই
এই যে জঙ্গল এর গভীরতা আমাকে জাগায়না আর একটুও
আমার কুঠার আমি ফেলে রেখে চ'লে যাবো
জঙ্গলের পথ চিরে নক্ষত্রের সবুজসঙ্কেত

মায়াপ্রজন্মের গান

জাগরী ও প্রাগৈতিহাসিক, তুমি জগদীশ গুপ্ত পড়েছো কি ?

শেষ কবে পড়েছো অসীম রায় কিম্বা বাবু কমলকুমার
রচিত গ্রন্থের মেঘ, বিশ-বাইশ লাইন ? উডকাট ?

কে কাকে পুরস্কার দেবে, বলো ?
প্রতিবিপ্লবীও হেসে কথা কয় হত্যা করে নারী-শিশু
কেড়ে নেয় বৃদ্ধের হাত থেকে মোচড়ানো লাঠি ও চশমা !

নদীর ওপার থেকে মেঘছোঁয়া হাওয়া এসে আজ
নদীর এপারে
আলুথালু ক'রে দ্যায় শিশুর নরম ভেঁপু, ধানবন, কুমারীর স্তন
ভুলস্বপ্ন মানুষের বারবার পর্যুদস্ত হয়
মানুষ জানেনা কেন সূর্যের সাতরঙ তাকে প্লাবনের দিকে নিয়ে যায় !
কেন জন্ম, কেন মৃত্যু, কেন এই রক্তমাংসক্লেদাসক্ত
প্রজন্মের প্রতি তার এতো মায়াটান !

বিহ্বল নারীর কাছে, আমি কিন্তু, শিখিনি মেঘের ভাষা,
শিলালিপি, জানুভিক্ষা ছাড়া কোনো গান।

ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ ঐ নবদম্পতির প্রেম আজ জেলে দ্যায় অরণ্যে আগুন

আর ঐ আগুনের মধ্যে পাখি চুপ শুয়ে গান গায়, দোল খায়, হেঁটে যায় নদী
ধ্বনি ও শব্দের শিস্ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, আমি ও দ্রৌপদী
নীতিকাণ্ডজ্ঞানহীন, যেন তার পাশে শুয়ে চাঁদ দেখি, দেখি দূর নক্ষত্রমালাও
দেখি সূর্য বিকলন, দর্শন ও জায়ফল, দেখি ভিজে ছুঁয়ে ভাষা দ্বিতীয় অর্জুন
সূর্য ডুবে যায়, কিন্তু ডোবেনা সূর্যের ভাষা ঃ গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথ অথবা লু শুন
হে অধীতবিদ্যারাজি, তুমি মাংসাপিণ্ডভুক, শুধু কি গ্রন্থের পাতা খাও

ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ ঐ নবদম্পতির প্রেম আজ জেলে দ্যায় অরণ্যে আগুন

অন্ধসত্য

কেবল অন্ধের জন্য সত্য সাড়ে তিনহাত খাড়ি
সবুজ অনন্য লন, মকরকঙ্কণগুন, ধীরে টানে গুণ
পদ্মলোচনের বৌ কালিন্দী, গোসাপ—জানেনা কেমন গোলাবাড়ি
কুঙ্কুম, শেল্‌ফের পরে, কাঠের বেবুন, শক্‌-হূণ

টানা নৌকোর টং-এ হাতপাখা-আঁকা পাখি
শিশি ও টিনের কৌটো, শানা-ব, সুতো ও মাকু
আসলে কলঙ্কে খুঁত্‌, কঙ্কালের পুরোটা চালাকি
ঝাঁঝরা-শ্মশানের পাশে প'ড়ে রয় শুকনো গুড়াখু

তবে কি অন্ধতা আজ মানুষের হালকা নীল বাড়ি
রয়েছে অন্ধের জন্য সত্য সাড়ে তিনহাত খাড়ি

ইদানীং অজ্ঞাতবাসের আমরা মানস ভট্টাচার্য

নগরীর মহৎ রাত্রিতে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত···

এটাই কলকাতার প্রাণকেন্দ্র
আমরা কয়েকজন ছেলে কলকাতার হৃৎপিণ্ডের উপর বসে আছি দীর্ঘদিন ধরে।
ধাপে ধাপে ঈশ্বরের ক্রোধের মত তপ্ত এক প্রবাহ আমাদের চোখ চুল আর ত্বক স্পর্শ করে চলে যায়। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ।
বিচিত্র ভঙ্গিমায় একজন মাতাল ও সমকামী হেঁটে যায় সামনে দিয়ে। স্বাভাবিক চৈতন্যে ফিরে আসি ফের।
এ জায়গাটা শহীদমিনার এবং তার আশপাশের অঞ্চল।
এরকম একটা মুক্তাঞ্চলকে ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করলে মফঃস্বলের ডাকপিয়ন আমাদের খুঁজে পাবে না তা বন্ধু-বান্ধব তো কোন কথা।
মুক্তাঞ্চল মানে রাজনৈতিক প্রভাবিত এবং দখলীকৃত নয় যদিও অন্য অর্থে ভিখারী এবং ভবঘুরে হকার আর ব্ল্যাকার বেশ্যা ও সমকর্মী প্রেমিক ও প্রেমিকার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।
এ ধরনের উর্বর জমিতে ঘুষের চাষের জন্য পুলিশ কিছু থাকবেই এবং আছেও।
এদের সঙ্গে আমরাও আছি। শহীদ মিনারের সামনে বাস রাস্তার পরেই ময়দান যেখানে সুরু সেখানে বলদেবের চায়ের দোকানের ত্রিপল ঢাকা ছাউনীর নীচে শীতে এবং বর্ষায়। গরমকালে শহীদ মিনারকে ঘিরে বাঁধানো চত্বরে কখনো নীচে কখনো ছোট এবং প্রশস্ত দেওয়াল ডিঙিয়ে মিনার বেদীর সর্বোচ্চ ধাপে।
প্রথম খেপ পুলিশ এসে বলদেবের দোকানসহ আশপাশের সবকটা চায়ের দোকান তুলে দিল পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া আর লুকোচুরি খেলে বলদেবের দোকনটা থাকল আড়ালে আবডালে কিন্তু শীত বর্ষার ছাউনি ত্রিপলটা আমাদের গেল, তারপর গেল শহীদ মিনার। প্রথমে মেরামতি। তারপর পড়ল রং। মিনার ঘিরে লোহর বেড়া—বেড়ার প্রান্তে লোহার গেট—লোহার তালা।
সভ্য ভব্য হয়ে লালিম আভা বিচ্ছুরিত হতে থাকল মনুমেন্টের মাথায়। খাস অক্টোরলণী সাহেবের লাল মুখের স্মৃতি ফিরে এলো। এই বেহায়াপনায় ভিক্টোরিয়া শীর্ষের নৃত্যরতা পরী সেই যে মনুমেন্টের দিকে পিছন ফিরল তার মুখ ফেরায় কার সাধ্য।

এই রক্ষণশীল মেমসাহেব পরীর মান ইঞ্জিনীয়র দিয়ে ভাঙানো যাবেনা তবে বড় গীর্জায় ফাদার মন্ত্রপূত জল এবং ওয়েডিং রিং—এই সব খাঁটি খৃষ্টীয় পদ্ধতিতে যদি পরীর মুখ ফেরানো যায় তো সে অন্য কথা।

যাইহোক উৎখাত আমাদের বলদেব জায়গা করে দিল। নিজের চায়ের দোকান আর ৩২ নং বাস গুমটির মাঝখানে শিশু বট গাছটার বাঁধানো চত্বরে। ছাউনির ত্রিপল এখন বসার সতরঞ্চি।

এখনও রোজ পুলিশ আসে। আগে থেকে খবর পেয়ে বিল্লাট চেঁচিয়ে ওঠে—তুরান্ত!

খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে দৌড়ে যায় অরবিন্দ আর টেনিয়া। একটু দূরে আড়ালে রাখা ভ্যানটার দিকে। চায়ের কেটলি আর গ্লাস নিয়ে তার পিছন পিছন ছোটে লাল আর রতন বেঞ্চিগুলি নিমেষে হাপিস। উনুন দুটো যায় হারিয়ে। তারপর পুলিশ চলে গেলে পুলিশের এই যাওয়া এবং আসার বিষাদ এবং হর্ষে বিচলিত বলদেব মাঝে মাঝে সমীরকে ডেকে নিয়ে যায় বাস গুমটির পিছন দিকে। একটু বেশী রাতে।

চা তখন বিদ্বাদ লাগে আমার কাছে। গ্লাস হাতে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকি চারহাত দূরে সমীরের দিকে কাঁচের গ্লাসে টলটল করে জল। জলের কিনারে রূপোলী আভা।

৩২ নং বাস গুমটির ভিতর থেকে স্টার্টার শেষ বাঁশী বাজায় তীক্ষ্ণ স্বরে। সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে মুখর্খাস্ত করতে করতে ক্লান্ত কণ্ডাকটর টলতে টলতে বাসে ওঠে।

কলকাতার বুকের উপরে বসে ধক্ ধক্ আওয়াজটা তখনো স্পষ্ট শুনতে পাই আমরা কজন।

এই আমাদের আড্ডার পরিবেশ আমাদের ঠিকানা।

এই আড্ডার স্থায়ী সদস্য সমীর আর সোমনাথ। ওদের কাজ আর অকাজ সব কিছুই ফিল্মকে নিয়ে। কিছুদিন আগে সময়টা যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৫-এর শেষ অথবা ছিয়াত্তরের গোড়ায় নেশার কথা বাদ দিলে ওদের দুজনের ফিল্ম করার অভিজ্ঞতা বলতে T.V-র একটা ছবি "পাঙ্কী থেকে ট্রাম"। এ ছাড়া সোমনাথ এক নাগাড়ে চিত্রনাট্য লিখে চলেছে। কলেজ পাঠ্য ইংরেজী কবিতা থেকে বুদ্ধদের বসুর কবিতা কেউ বাদ যাচ্ছে না। এরকম একটা সময়ে ঋত্বিক ঘটক তখন মারা গেছেন—একদিন সকালবেলা শ্যামবাজারের আড্ডায় সোমনাথ ওর চিত্রনাট্য "বিস্ফোরণ" নিয়ে হাজির। তারপরে ছাপার অক্ষরে প্রথমে 'অজ্ঞাতবাসে'। কালিমাখা সীসের হরফে নিজেদের স্ক্রীপ্টের শেষ গতি দেখতে সমীর মোটেই রাজী ছিল না। সুতরাং ছবি তৈরীর জন্য আর্কাইভস্-এ রাখার মত একটা বাজেট তৈরী হোলো। বিশ মিনিটের ছবি তৈরীর জন্য এর চেয়ে কম টাকার বাজেট আজ পর্যন্ত তৈরী হয় নি। আসলে এটা ছিল নিজেদের সাহস জোগানোর জন্য। তারপর যে টাকা সম্বল করে ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় নামল ওরা দুজন তার পরিমাণ শুনলে গড়িয়াহাট রোডে শাড়ী কিনতে আসা পৃথুলা রমণীরা শরীরে ঢেউ তুলে জলতরঙ্গের মত হেসে

উঠবেন—অবহেলায় ভ্যানিটি ব্যাগে দমবন্ধ কারেন্সী নোটগুলোকে বিপর্যস্ত করে। কেউ খিল খিল করে প্রশ্রয়ের হাসি হাসুক অথবা গম্ গম্ করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করুক ফিল্ম কিন্তু এভাবেই সম্পূর্ণ হয়েছে। সরকারী দরে বিক্রির ব্যাপারে আলোচনা চূড়ান্ত। ব্যবসায়িক লেনদেনটুকুই বাকী। এরই ফাঁকে T.V.-তে একটা animation. দশ মিনিটের এই animationটা তৈরী করতে যত খরচ হতে পারে বলে আমাদের ধারণা সময়ের সেই সব হিসেব নিকেষ উপ্টে দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছবিটা শেষ করছে ওরা দুজন।

লম্পট যে তীব্র আকর্ষণে নারীর কাছে যায় ভগ্ন ও বিপর্যস্ত পুরুষ যে নিরুপায় টানে ঈশ্বরের কাছে প্রায় সেই তীব্রতা নিয়েই—মাঝে মাঝে নিরতি তাড়িত বলে মনে হয়—ওরা ফিল্মের আকর্ষণের কাছে পরাভূত ও নতজানু।

শিল্পের নেশায় আকণ্ঠ মাতাল ও নিমজ্জিত এই দুই স্বেচ্ছা বেকার যুবকের সাথে প্রায় রোজই আড্ডা দিতে আসে বিশু। প্রায়শই অন্তিম লগ্নে। ভারী গলায় গান গায় চমৎকার। হাতে ভি আই পি এ্যাটাচী লম্বায় অনেকখানি আনুপাতিক হারে কম চওড়া মুখ ভর্তি দাড়ি বিশুর গলায় গানের চেয়ে কবিতাই বেশী শোনা যায়। কবিতা বিষয়ে প্রখর শ্রুতিধর এই যুবক যখন অমিতাভ দাশগুপ্তর—"তুমিই আমার সেই শেষ ঘোড়া"—কিংবা শঙ্খ ঘোষের—"জবালা যাবার পথ আমাকেই চিনে নিতে হবে'—আবৃত্তি করে তখন জানা যায় জীবনের কোন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বে ও নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্নিত।

আর্ট কলেজের প্রফেসর সুখেন এলে আড্ডার চেহারাটাই বদলে যায়। ইদানীং বিবাহিত ও অনিয়মিত হাজিরা সত্ত্বেও ভিতরের মেজাজী মানুষটা আগের মতই উচ্ছল ও অসংযত। শুধু ছবির বিষয়ে কথা উঠলে অন্যরকম। তখন নগ্ন সুখেনের ভিতর থেকে আর এক সুখেন কথা বলে যেন ছবি আঁকার মত ছবি কথা বলেও ও তৃপ্তি পাচ্ছে।

ছিটগ্রস্ত ও বোহেমিয়ান ধ্রুবক মানস বিশ্বাস আমাদের আড্ডায় কবে কখন আসবে তা আমরা কেউই জানি না। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়া ছাড়া ওর জীবনে আর অন্য সব কিছুই এক সাবলীল অনিশ্চয়তায় ভরা। এক দীর্ঘ অনুপস্থিতির কালে আমরা শুনতে পাই কেউ একজন বোলপুর থেকে ওকে কুড়িয়ে এনে মৃণাল সেনের খানদারের সেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর্ট ডিরেকটার নীতিশ রায়ের তত্ত্বাবধানে। ফিল্মের ফাঁকির ব্যাপারটায় ও প্রথম কিছুদিন বেশ মজা পায় তারপর দ্বিতীয় কাজ পাবার সম্ভাবনায় ও ভয়ে সে আবার নিপাত্তা। খর্বকায় বৈশিষ্ট্যহীন শীর্ণ চেহারার কিশোরাকৃতি এই যুবকের উপস্থিতি যে কোন দিন প্রত্যাশা করছি আমরা।

মাঝে মাঝে দীপক আসে। আগে কবিতা লিখত। এখন শোনেও না। শুধু কখনও সখনও লোলচর্ম নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার মত 'মনেও নেয়না আমাকে' বলেঅক্লেশে ধরে শক্তির কবিতা—"ভালবাসা সবই খায় খায়না আমাকে।"

অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরিচয় এখানেই। বহুবার শোনা তবু জীবনের এক অচেনা চোরা স্রোতের টানে ইদানীং ও টালমাটাল।

সমীর আর সোমনাথ এই আড্ডাকে অর্দ্ধেন্দু ছাড়াও ভোলা সুব্রত আর শুক্লার মত বন্ধু উপহার দিয়েছে। ভোলা আর সুব্রতর মধ্যে গোপন অন্তরঙ্গতা আছে যার হদিশ হয়তো শুক্লা জানে। একা একাই সাহসী মেয়ে শুক্লা এখন চাকরী পেয়ে বাঁকুড়ায়।

আরও দুজন আসে এখানে। একজন সুহাসিনী। দেখা হলেই সমীরকে একটুকরো হাসি দিয়ে পরিচয়কে স্বীকার করে নেয়। অন্যজন স্বাস্থ্যশীর্ণা রঙে শ্যামলী। ট্রাউজারের উপর ছড়িয়ে দেওয়া সার্ট আধুনিকতা নয় স্বাভাবিক আবরণ। চোখে চশমা মুখে চিন্তাক্লিষ্ট অন্যমনস্কতা। নাছোড়বান্দা আমাদের একজন এই মুখের দিকে হেসে পাল্টা হাসি দাবী করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

"সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি"—জীবনানন্দের এই কেউ কেউ কবির একজন অরুণ বোস আমাদের দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ ও আড্ডার অন্যতম সদস্য। নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনুশাসন ব্যতীত আজ'-এর মত অরুণও কোন অনুশাসনে বিশ্বাসী নয়।

বিশ্বাসী নয় কারণ অরুণ জানে যে প্রাণবন্ত মানুষ প্রজ্ঞার দশটি অনুশাসনের সঙ্গে আমৃত্যু বিপরীত আসংগে লিপ্ত এমনকি অন্তিম মুহূর্তেও বোঝে অনুশাসনের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাহীনতা।

তাই অন্য এক বোধ থেকে আর এক সুজাতার কাছে নির্বাণ ভিক্ষা করে অরুণ। সে গভীর বিশ্বাস থেকে ওর প্রার্থনা তাতে মনে হয় এই বোধিবৃক্ষ যদি আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কারকে ছড়াতে চায় তবে তাকে উৎপাটিত করে শিকড়ে অন্য চেতনা সিঞ্চিত করবে অরুণ—তাকে পুনর্ন্নরোপিত করবে ভিন্ন মহিমায়।

আর আমি আসি। রোজ।

গনগনে চুল্লীর মত তপ্ত এই কোলকাতার বুকের উপরে আমরা কজন ছেলে রোজ বসে থাকি। হৃদপিণ্ডের ধক্ ধক্ আওয়াজ শুনি। কারা যেন অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেছে আসন্ন ও অনিবার্য এক অলৌকিক বিস্ফোরণের কথা। কলকাতার বুকের উপর বসে ভিতরে নিহিত সেই অজ্ঞাত অস্থির উত্তেজনায় ধক্ ধক্ আওয়াজ আমাদের কানে রোজ স্পন্ত করে বাজে—শিরা ও উপশিরায় বহতা রক্তের স্রোতে তার স্পষ্ট সংকেত পাই।

এ শহর আমাদের ভালবাসার এ নগরী আমাদের ঘৃণার।

ধূর্ত রাজনীতিবিদ আর ঘৃণ্য প্রতারকের হাতে এ শহরকে আমরা ছেড়ে দেবোনা। বিস্ফোরিত কলকাতার পবিত্র আগুন দিয়েই নিজেদের চিতাগ্নি জ্বালাব। আর যদি কোন শয়তান ক্ষোভ ও লালসাকে পুষ্ট করার জন্য অনিবার্য ভবিষ্যতকে টিকানোর চেষ্টা করে তবে কোলকাতার হৃদপিণ্ডের ভিতরে ঢুকে বারুদের মত ফেটে পড়ব ভয়ংকর কালো রঙের আগুন ছিটিয়ে তারপর রেণু রেণু করে মিলিয়ে দেব আকাশে।

আমাদের প্রেম ও ঘৃণাকে।

তখন পাপ কারোর অনুগমন করবে না পুণ্য কারোর অনুগামী হবেনা।

বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সরোজ দত্ত

Mephistopheles the emancipated intellect, is abroad
Dr. B. N. Seal

তোমার বুদ্ধির সুধা সুরা হল আঁধারে পচিয়া
সে অগ্নি-পানীয়ে নিত্য জলে তব ঘৃণ্য পাকস্থলী,
কৌমার্য্য করিতে রক্ষা আত্মরতি সম্বল তোমার,
তোমার দুর্বল কণ্ঠে স্বেচ্ছাবন্দী পাখীর কাকলি।
প্রাণশক্তি প্রাণহীন, ধরিয়াছ প্রাণঘাতী নেশা ;
চরণে কাঁদিছে কায়া, ছায়া ভাবি হাসো উপহাসে—
করেছ গতির রক্তে পঙ্গুতার প্রশান্তি রচনা,
বিচ্ছেদ ভুলিতে চাহ বিরহের নির্বীর্য বিলাসে।
প্রসবের ব্যর্থতায় অভিমানী সৌখীন শাখার
স্বার্থপর আত্মনাশ বনস্পতি করিবেনা ক্ষমা—
তৃষ্ণায় শ্বসিছে তবু শিকড়ের শূন্য ভাণ্ড হাতে,
সংবর এ ক্লীব কান্না, দ্যাখনি কি মৃত্তিকা নির্মমা !
রাজদণ্ড বহি শিরে, শ্লথ ছন্দে রচিয়া বিলাপ
যে চাহে অলকা, তার নির্বাসন যোগ্য অভিশাপ।